কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

মে '৮৪

দেবজ্যোতি
ধুলোখেলা
কিশোর
চিলেকোঠা
অতীতের সাগর সেঁচা মনি মানিক্যের সন্ধান
Please visit : http://dhulokhela.blogspot.in/
পড়ুন ও আমাদের
সংরক্ষনে সাহায্য করুন

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্টিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

বিজ্ঞপ্তি

কাগজ, মুদ্রণ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়বৃদ্ধির জন্য কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি সংখ্যার দাম অনোন্যপায় হয়ে আমাদের ২·৫০ থেকে ৩·০০ টাকা করতে হয়েছে। আশা করি কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুরাগী পাঠকেরা আমাদের এ অনুরোধ মেনে নেবেন।

গ্রাহকদের জন্য

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য ৩.০০ টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র গ্রাহক চাঁদা ৩০ টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।
- গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। **under certificate of posting**-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত ৩০ টাকা পাঠাতে হবে।
- **M. O.** বা **Bank Draft KISHORE JNAN-BIJNAN**-এর নামে পাঠাতে হবে।

নতুন গ্রাহক করা হচ্ছে

গ্রাহককার্ড রিনিউ করার জন্য ৩০ টাকা পাঠাতে হবে।

গ্রাহককার্ড রিনিউ করার শেষ তারিখ ১৫ জুন ১৯৮৪।

এজেন্টদের জন্য

- ১০ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা ২৫ টাকা।
- ভি. পি. বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হবে। ডাকমাশুল লাগবে না।
- এজেন্টদের অর্ডার অনুযায়ী সংখ্যাপিছু ১ টাকা করে অগ্রিম জমা রাখতে হবে।
- এলাকাভিত্তিক এজেন্সীর জন্য সাক্ষাতে অথবা চিঠিতে যোগাযোগ করুন।
- এজেন্সী রিনিউ করার শেষ তারিখ ১৫ জুন ১৯৮৪।

প্রচারসম্পাদক : কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড • কলিকাতা ৯

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

4র্থ বর্ষ 1ম সংখ্যা
মে 1984

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান তিন বছর পেরিয়ে চার-এ পড়ল। এই অল্প সময়ের ব্যবধানেই কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়গৌরবে এবং জনপ্রিয়তায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সম্পূর্ণ নতুন ভাবে সাজিয়ে বছরের প্রথম সংখ্যা তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া হল। রঙিন ছবিতে গল্পই শুধু নয়, কয়েকটি নতুন বিভাগও খোলা হয়েছে। আশা করি তোমাদের ভাল লাগবে। তোমাদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই।

প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর
সম্পাদক : রবীন বল
সহ সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত
ছবি এঁকেছেন—অনয় ঘোষাল

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় 1 ॥ চিঠিপত্র 2
দপ্তর থেকে : ধূলীঝড় ॥ সমরজিৎ কর 4

বিশেষ রচনা

মৌ-কা-সা-বি-স একবচন না বহুবচন ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র 7

পড়াশোনা

চিহ্ন সংকেত যোজ্যতা ॥ অমরনাথ রায় 28, গ্যাসের ব্যবহার—ক্যাথোড ও অ্যানোড রশ্মি ॥ অলক চক্রবর্তী 36, সালোক সংশ্লেষ ॥ দিনোজ কুমার দে 44
অক্ষবিহীন গ্রাফ ॥ অসিতকুমার চক্রবর্তী 16

ছবিতে গল্প

খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 18, 19
বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র ॥ দিলীপ দাস 20
লস্ট ওয়ার্ল্ড' ॥ গৌতম কর্মকার 45, 46, 47, 48
মজার ছবি ॥ প্রণব হোড় 24, খোঁজ খবর ॥ 17
কেমন করে কাজ করে : লিফট বা এলিভেটর ॥ অনীশ দেব 38
বুদ্ধি নিয়ে খেলা : পার্থসারথি চক্রবর্তী 40

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

ট্রয়ের ঘোড়া ॥ জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার ॥ অনুবাদ নিরঞ্জন সিংহ 9
প্রফেসর ব্রহ্মের সমুদ্র সন্ধান ॥ সুধীন্দ্র সরকার 29
আবিষ্কারের গল্প : ট্রামগাড়ির কাহিনী ॥ মধুসূদন পাল 33

পশু পাখি উদ্ভিদ

উগ্রবিষ সাপ গোখরো ॥ বিকাশকান্তি সাহা 14
ছিপ্পক বর্গের পাখি ॥ অজয় হোম 34 নারিকেল গাছ ॥ রবীন্দ্রনাথ সর 25
উপন্যাস : সবুজ বনের গান ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 21
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী : শান্তিরঞ্জন পালিত ॥ বিবেক রায় 37

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা

চন্দ্র অভিযানের গোড়ার কথা ॥ বাচ্চু মুখার্জী 26
পরিবেশ দূষণে ক্যান্সার হতে পারে ॥ মিহির সরকার 15
বিচিত্র সংবাদ ॥ জয়শ্রী দত্ত, অভিজিৎ মিত্র 43 বিজ্ঞান সংবাদ ॥ 56
স্বাস্থ্যরক্ষায় সঙ্গীত ॥ জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় 42
ছড়া : অবাক ফাঁদ ॥ বীরেশ ঘটক 35
ছোটদের দপ্তর : গত সংখ্যার নলেজ কুইজের উত্তরদাতাদের নাম 49
বেতার তরঙ্গ প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র ॥ সেখ সামসুদ্দিন 50
গত সংখ্যার রোবটকূটের সমাধান 50
নলেজ কুইজ ॥ অমরনাথ রায় 51 রহস্যের অন্তরালে ॥ সুদীপ্ত দাশগুপ্ত 52
ভেবে ভেবে বল ॥ শুভব্রত রায়চৌধুরী 53, শব্দকুট ॥ রণবীর বসু 53
প্রশ্নোত্তর ॥ সুধাংশু পাত্র 54
আলসার বা ক্ষতরোগ সম্বন্ধে টুকিটাকি ॥ অসীম কুমার চক্রবর্তী 55

চিঠিপত্র

রঙিন ছবিতে গল্প চাই

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দাম বাড়ানোতে আমরা একটু অসুবিধায় পড়েছি। আশা করছি আমরা এই অসুবিধা কাটিয়ে উঠব। আপনারা পাঠকদের মতামত জানতে চেয়েছেন। আমরা সমবেত পাঠকবৃন্দ জানাচ্ছি যে, এই দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়ে, তাহলে ভালো হয়। এছাড়া 'নিজে করো' বিভাগটি আরো একটু উন্নত ধরণের প্রস্তুত (ইলেকট্রনিকস্) প্রণালী দিলে ভালো হয় এবং প্রতি সংখ্যায় অন্ততঃ দুটি করে মডেল থাকলে ভালো হয়। এছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা, জানা-অজানা, ছবিতে গল্প (রঙিন) এবং নানা আকর্ষণীয় বিষয় বাড়ালে ভালো হয়। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়মিত পাঠক আমরা।

প্রসেনজিৎ পাল ও ক্লাবের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

আরও নতুন বিভাগ

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চতুর্থ শুভ নববর্ষে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। এই পত্রিকা বর্তমান সময়ে দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ নিয়মিত ভাবে বেরিয়েছে—এটা খুবই আনন্দের বিষয়! পত্রিকা চারদিকে প্রসারলাভ করেছে—তবুও এর সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য রাখছি—

I. আপনারা 'আমি যা দেখছি' বিভাগটি চালু করে আবার বন্ধ করেছেন কেন?

2. বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী এবং আবিষ্কারের গল্প নামক বিভাগ দুটিও মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

3. বিজ্ঞান পত্রিকা হলেও 'খেলাধূলা' সম্বন্ধে একটা বিভাগ খুলতে পারেন।

4. আপনারা 'শরীর স্বাস্থ্য চিকিৎসা' নামক একটা বিভাগ খুলেছেন। কিন্তু এতে আপনারা খারাপ শরীর ভালো করার ব্যবস্থার কথা বলছেন। তার সঙ্গে যদি কি করে স্বাস্থ্য ভালো রাখা যায়, অর্থাৎ কি করলে শরীর খারাপ হবে না বলেন, ভালো হয়।

5. অংক বিষয়ক একটি বিভাগ চালু করতে পারেন।

প্রণব কুমার মজুমদার, খড়গপুর

শুভেচ্ছা পত্র

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান তুমি আমাদের অর্থাৎ কিশোর-কিশোরীদের মনের মণিকোঠায় অনেক খানি জায়গা করে নিয়েছো। মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে প্রস্তুতির সময় অভিজ্ঞ শিক্ষক হিসাবে আর পরীক্ষার পরের অকেজো দিনগুলোতে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে তোমার দান আমি ভুলব না। তোমাকে আমার শুভেচ্ছা রইল।

শতরূপা মজুমদার চৌধুরী, দুর্গাপুর-2, বর্ধমান।

মাধ্যমিক ঐচ্ছিক জীববিদ্যা পরীক্ষা ঃ 1984

Suggestion এর প্রশ্ন নম্বর	মাধ্যমিক ঐচ্ছিক জীববিদ্যার 1984 সালের প্রশ্ন নম্বর	নম্বর যা Common এসেছে	শতকরা যত নম্বর Common
1, 8, 7, 15, 17-b, 14, 18	1, 2, 4, 6, 8, 9	15 + 14 + 16 + 12 + 16 + 14 = 87	100 নম্বরে Common এসেছে 87 অর্থাৎ 87% Common.

সুদীপ্ত বাগুলী, জগৎপুর, বেহালা, কলি-34

পত্র মিতালী

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার সবকটি বিভাগ আমার খুব ভালো লাগে। পত্রিকাটিতে 'পেন ফ্রেণ্ডস' বা 'পত্র মিতালী' জাতীয় একটি নতুন বিভাগ খুললে ভালো হয়। আমার মনে হয় পত্রিকাটি এতে আরো আকর্ষণীয় হতে পারে। আর পত্রালাপ বা চেনা-জানার মাধ্যমে এমন কোন সূত্র খুঁজে দিতে পারে—যা বিজ্ঞান বিষয়ে অপেক্ষাকৃত জ্ঞানলাভের পক্ষে সহায়ক হতে পারে। আমি এ ব্যাপারে পত্রিকার পরিচালক মণ্ডলী এবং অন্যান্য পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জয়দীপ দাশগুপ্ত, 1252/B.D.S
কলোনী আলিপুরদুয়ার জং, জলপাইগুড়ি

সংশোধন

জানুয়ারী '84 সংখ্যায় 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ' শীর্ষক লেখায় 39 তলা বিশিষ্ট যে হোটেলটির কথা বলা হয়েছে—সেটা 93 তলা পড়তে হবে।

ঘনাদার বয়স কত ?

গতকাল সাবধানে ঘনাদারে শুধানু,—
"আপনার বয়সটা দাদা কত হইনু?"
গড়গড়া টানিয়া ঘনাদাদা কইনু—
"চুরাশির মার্চে বারো পার করিনু।"
"একি শুনি!"—গজেনের কানে কানে
শুধানু।
গজেন বলিনু মোরে—
নিরেট বকারা ওরে—
ঘনাদার জন্ম যে লিপিয়ারে হইনু॥"

বশিষ্ঠ গোস্বামী, কলেজপাড়া,
বনগাঁ, 24 পরগণা।

অদ্ভুত পাখি

এপ্রিল '84 সংখ্যায় "অদ্ভুত পাখি" বলে যে লেখাটি মানস কুণ্ডু দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে পর্যবেক্ষণ করে লিখেছেন সেটি কণ্ঠিকুট্ট বর্গের মধ্যে হলেও তার চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। ছবিতে দেখানো হয়েছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের গ্রীষ্মবাংলার অতি সাধারণ সোনালি-পিঠ কাঠঠোকরার।

পাখিটি কাঠঠোকরা বর্গের অন্তর্গত ভিন্ন বংশের পাখি। সেই বংশকে বলে মধুমাক্ষিক বংশ (Indication)। এই পাখিকে ভারতেও দেখা যায়। খুবই দুষ্প্রাপ্য পাহাড়ী পাখি। হিমালয়ের বান্নু, হাজারা, মারি থেকে নেপাল, ভূটান, সিকিম, আসামের নাগা পাহাড়, মার্গারিটা এবং উত্তর বার্মার মিচিনা জেলায় দেখা যায়। তবে মানস কুণ্ডুদের যেমন মৌচাকের কাছে নিয়ে গিয়েছিল তার প্রধান খাদ্য মোমের জন্য, তেমন ভারতের মধুমাক্ষিরা (Honey guide) করে কিনা তা এখনও জানা যায়নি। আমাদের জঙ্গলে আসার দৃষ্টিপথে একবার মাত্র পড়েছিল সেকথা লিখেছিলাম 22 বর্ষ, 1361, 24 সংখ্যায় 'মৌ-সন্ধানী, নামে। চেহারা তার সম্পূর্ণ আলাদা, মাথায় ঝুঁটিও নেই। 'দেশ'-এ একটা ছবিও দিয়েছিলাম। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে ছবি বেরিয়েছে হয়তো বিভ্রান্তিজনক। আফ্রিকার মৌ-সন্ধানীরা মানুষ এবং মধুভূকদের (র‍্যাটেল, মেলৃলিভোরং কাপনসিস) মৌচাকের কাছে আকৃষ্ট করে নিয়ে যায়।

অজয় হোম
৪/1, ডঃ বীরেশ গুহ ষ্ট্রীট, কলি-17

ঘনাদা ক্লাবের নিয়মাবলী

নিম্নলিখিত ঘনাদাবিষয়ক দশটি প্রশ্নের মধ্যে যাঁরা অন্তঃত তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন, তারা সাধারণ সদস্য, যারা সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন তারা বিশেষ সদস্য এবং যারা দশটির মধ্যে দশটি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারবেন, তারাই কার্যকরী সমিতির সদস্য হবেন।

১। ঘনাদার প্রথম গল্পের নাম কি? ২। নকল ইবন করিদের সঙ্গে ঘনাদার কোথায় আলাপ হয়েছিল? ৩। ঘনাদার দাদার নেশা কি ছিল? ৪। বাপী দত্তর খালি সীটে মেসে নতুন বোর্ডার হিসেবে কাকে নেওয়া হয়েছিল? ৫। দ্বিতীয়বারের মহাকাশ যাত্রায় ঘনাদার সঙ্গী ছিলেন কে কে? ৬। 'ইন্দ্রলুপ্ত নিবারণী' কি জিনিস? ৭। ই. ইউ. ডব্লিউ. সি. এবং এম্. বি. ডি. ও. ই. কথা দুটির সম্পূর্ণ অর্থ কি? ৮। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ ঘটেছে অথচ মহাভারতে নেই—এমন কোন ঘটনা ঘনাদা কৌরবদের পরাজয়ের কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন? ৯। 'পর্দাচিরস মার্মোরেটাস' কিসের নাম? ১০। 'কয়া' কে?

ঘনাদা ক্লাবের সঠিক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বিশেষ সদস্য হলেন—ভাস্কর নন্দী ও অভীক চক্রবর্তী, ১৬ মনোরঞ্জন পল্লী. কালিকাপুর, বারাসাত, 24 পরগণা। সাধারণ সভ্য হলেন—শুভাশিস ঘোষ, কেশবপুর, হুগলী ও সুদীপ ভট্টাচার্য, 4নং দেবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী লেন, হুগলী।

দপ্তর থেকে

ধূলিঝড়

সমরজিৎ কর

এই তো মে মাস। বছর চার আগে, 1980 সালে, এই মে মাসেই ব্যাপারটা ঘটেছিল। বিহারের বস্তি এবং গোরখপুর জেলার উপর দিয়ে বয়ে গেল প্রচণ্ড ধূলি ঝড়। তার গতি ঘণ্টায় 120 কিলোমিটার। এই ধূলি ঝড়ের মুখে পড়ে ছয় জন প্রাণ হারায়। মারা যায় একশর মত গবাদি পশু।

ঝড়ের দিন সকাল থেকেই আবহাওয়াটা কেমন যেন থমথমে ছিল। কয়েক দিন ধরে চলছিল প্রচণ্ড তাপ প্রবাহ। বাতাসের হলকা শরীর পুড়িয়ে দিয়ে যায়। পুকুর ডোবা খরায় খটখটে। জলের জন্যে চারদিকে হাহাকার। আকাশে মেঘের চিহ্নটুকু নেই। কয়েক দিন ধরে বিকেলের দিকে দেখা যাচ্ছিল আকাশের রঙ তামাটে। অবশেষে ওই দিন, অর্থাৎ যে দিন ঝড় উঠল, সেদিন বিকেল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক দ্রুত ঘোলাটে হয়ে উঠল, নেমে এল অন্ধকার, সেই সঙ্গে প্রথমে মৃদু বাতাস। তার পর নামল ঝড়। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের উপর দিয়ে রাক্ষুসে থাবা বাড়িয়ে। গ্রাস করল গ্রামের পর গ্রাম। এক দল গরু ছুটছিল মাঠের উপর দিয়ে। তাদের মধ্যে একটি ছিটকে পরে গেল ঝড়ের প্রচণ্ড দাপটে। হাওয়ায় যেমন কাগজ ওড়ে, ঠিক তেমনি ঝড়ের তোড়ে গরুটি উড়ে চলল শক্ত মাটির উপর দিয়ে। এক জন চাষী সেই ঝড়ে পড়ে যায়। কোন রকমে প্রাণ হাতে করে ফিরে এসে সে বলে, আমি তখন অন্ধকার দেখছি। ধূলি কণায় আমার দু চোখ জ্বালা করছে। মনে হচ্ছিল, চোখে ছুঁচ বিঁধছে। মুখের ভেতর ধুলো। গলায় গিয়ে জমছে। প্রচণ্ড ভাবে কাশতে শুরু করলাম। শ্বাস বন্ধ হওয়ার মত অবস্থা। মাথা ভর্তি মাটি। ঝড়ের ধাক্কায় এক সময় মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। কতক্ষণ প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ক্ষেতের উপর পড়েছিলাম, জানি না। ঝড় যখন থামল, আমার সারা শরীর তখনো ভয়ে কাঁপছে। ভাগ্যিস পড়ে গিয়েছিলাম। নইলে দম বন্ধ হয়েই হয়ত মারা যেতাম।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, বস্তি এবং গোরখপুর জেলার ওই ধূলিঝড় একটা বড় রকমের বিপদের সংকেত। মানুষ যদি সাবধান না হয়, তা হলে আরো বেশি করে দেখা দেবে এমন ঝড়।

এ দেশে ধূলি ঝড় এমন কোন নতুন ঘটনা নয়। রাজস্থানের থর মরুভূমি এলাকায় গরমকালে প্রায়ই ধূলি ঝড় ওঠে। উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও ধূলিঝড় দেখা যায়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, গত পঁচিশ তিরিশ বছরে ধূলিঝড় যেন আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশের বহু জায়গায় এখন মরুভূমির মত অবস্থা। একটু বাতাস উঠলেই এ সব অঞ্চলে ধুলো উড়তে থাকে, বাতাসে ধুলোর পরিমাণও বাড়ে অনেক। দেখা গেছে রাজস্থানের থর মরুভূমি এলাকায় বাতাসের তোড়ে দৈনিক 300 টনের মত ধূলিকণা উড়ে যায়।

আগ্নেয়গিরির কথাই ধরা যাক। পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে অজস্র আগ্নেয়গিরি। আগ্নেয়গিরিতে বিস্ফোরণ ঘটলে তার গহ্বর থেকে নির্গত হয় প্রচুর ভস্মকণা। সেই ভস্ম ঊর্ধাকাশে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার পর্যন্ত। সেখানে নিয়ত বেগে বাতাস বয়। সেই বাতাসে আগ্নেয়গিরির ভস্ম বহুদূর পর্যন্ত ছড়ায়। কখনো কখনো এই ভস্ম বাতাসে মাসের পর মাস ভেসে থাকে এমনও দেখা যায়। যেমন ধর ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ, জাভা এবং সুমাত্রার মধ্যিখানে এই আগ্নেয়গিরিটিকে দেখাত যেন

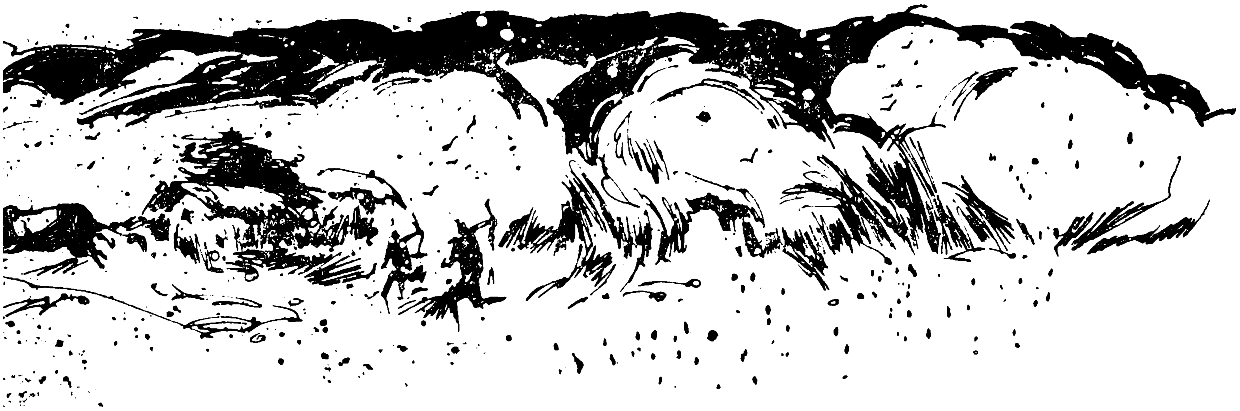

ছোট্ট একটি দ্বীপ। 26 আগস্ট, 1883, তাতে ঘটল প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের পর পৃথিবীর প্রায় সারা আকাশ ভস্মে ছেয়ে যায়। সূর্যের আলো পৃথিবীর বুকে আসতে বাধা পায়। এতে করে আবহাওয়ার তাপমাত্রাও কিছুটা কমে গিয়েছিল।

কিন্তু এতো গেল একটি দিক। মানুষের কথা ধর। জনসংখ্যা বাড়ছে। মানুষের মুখের গ্রাস যোগানর জন্যে চাই প্রচুর জমি। চাষের ভূমি বের করার জন্যে বনজঙ্গল কেটে ফেলার পর গাছের গুঁড়ি লতাপাতা যা কিছু পড়ে থাকে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। আগুনে জমির উপরের বাতাস গরম হয়ে হাল্কা হয়। সেই হাল্কা বাতাসের কাঁধে চেপে গাছ লতাপাতার ছাই চালান হয় উর্ধাকাশে। এছাড়া গাছপালা কেটে ফেলার দরুন মাটি শুকিয়ে যায়। প্রখর রৌদ্রে ফেটে গিয়ে তৈরী করে ধূলিকণা। ছাই এবং ধূলিকণা বাতাসকে ভর করে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে তোলে ধূলোর ঝড়।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মানুষ এবং পশুপাখি ধূলিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নানা ভাবে। ঝড়ে দম বন্ধ হয়ে মারা যাওয়া তো আছেই। তা ছাড়া ধূলিঝড় নানান রোগের জীবাণু ছড়ায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিমের মানুষ এক ধরনের জ্বরে ভুগে থাকে থাকে। রোগটির নাম 'ভ্যালি ফিভার' বা উপত্যকার জ্বর। 'কোক্‌কিডাইওইডেস ইনাইটিস' নামে এক ধরনের জীবাণু এই জ্বরের জারণ। এই জীবাণু ধূলিঝড়ে ছড়িয়ে পড়ে কখনো কখনো মহামারী সৃষ্টি করে। আর এক ধরনের জীবাণু আছে, যার নাম ক্রিপটোকক্‌কাস নিওফরমানস্‌। ঈস্ট কোষের মত এই জীবাণু মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, ফুসফুস এবং দেহত্বক আক্রমণ করে। এতে করে দেখা দেয় স্নায়বিক রোগ, শ্বাসকষ্ট এবং চর্মরোগ। নানা রকম উদ্ভিদ রোগেরও জীবাণু বহন করে ধূলিঝড়।

হয়ত প্রশ্ন করবে, বাতাসে ধূলিকণা থাকে। এ না হয় বোঝা গেল। কিন্তু তা থেকে ধূলিঝড় হয় কি ভাবে?

এ সম্পর্কে নানা রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে একটি হল এই রকম: ধূলিধূসরিত কোন জায়গা হয়ত প্রখর রোদে ঝলসে যাচ্ছে এমন সময় সেখানে মাথার উপর জমে উঠল একফালি বর্ষার মেঘ। মেঘ থেকে ঝরে পড়ল বৃষ্টি। কিন্তু এমনই কাণ্ড, বৃষ্টি হয়ত পড়ল। কিন্তু সেই বৃষ্টি মাটি পর্যন্ত আর পৌঁছতেই পারল না। মাঝ পথে বাষ্প হয়ে উঠে গেল। ছিটেফোঁটা যে একে বারে পড়বে না, তা অবশ্য বলছি না। তবে বেশির ভাগ বৃষ্টি কণাই হল বাষ্পীভূত। যেখানে বৃষ্টি পড়ল, শীতল জলের স্পর্শে সেখানে বাতাস হল শীতল এবং তার ঘনত্ব গেল বেড়ে। সেখানে তখন নিম্নচাপ সৃষ্টি হবে। শীতল বাতাস, বেশি ঘনত্ব– তাই ধেয়ে নিচের দিকে নেমে আসে। তারপর গরম মাটিতে আঘাত করে আবার বাষ্পীভূত হয়ে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যায়। মাটি যদি শুকনো এবং ধূলিময় অবস্থায় থাকে, বাতাসের ধাক্কায় সেই ধূলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই শীতল বাতাসের বেগ কত হবে সেটা নির্ভর করে মাটি থেকে মেঘ কতটা উঁচুতে রয়েছে তার উপর। উচ্চতা বেশি হলে বাতাসের বেগ বাড়ে। আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মরুভূমিতে ধূলি ঝড় এই ভাবেই হয়ে থাকে।

ধূলিঝড় থেকে মুক্তি পেতে গেলে তৈরি করতে হবে প্রচুর জঙ্গল। যতটা সম্ভব গাছপালা কাটা বন্ধ করতে হবে। এমন আরো অনেক কথাই ভাবছেন বিজ্ঞানীরা।

With Best Compliments From :

KIRLOSKAR

DIESEL GENERATING SET

Available in Single/Three phase 220/440 Volts from 1 KVA to 1000 KVA with Kirloskar Kirloskar – Cumins engines and Kirloskar alternators Diesel Generators from 40 KVA to 500 KVA ex-stock delivery.

Contact Authorised OEM & Distributors :

WESTERN INDIA MACHINERY COMPANY

24, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-700013

Phone : 27-8931/27-8962, Gram : DHINGRASON. Telex : 021-2675 (VINY)

Branch :

3850A, Shahaganj, G. B. Road, Delhi : 110006

Phone : 52-0178 Gram : DHINGRASON

AUTHORISED SELLING HOUSE FOR KIRLOSKAR PRODUCTS.

সাধন দাশগুপ্ত রচিত

আলো আরও আলো ১৫·০০

পদার্থবিদ্যার ক্রমবিকাশের প্রামাণ্য ইতিহাস !

রোমাঞ্চকর রসায়ন ১২·০০

রসায়ন বিদ্যার অগ্রগতির রোমাঞ্চকর কাহিনী !

ভাষা গণিত ২০·০০

গণিত কি কতকগুলো সংখ্যার খেলা, না তারও আছে ইতিহাস—দর্শন—ভাষা !

……

শিশু সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত

সুনির্মল রায়-এর

চাঁদে পাড়ি ৮·০০

বহু প্রত্যাশিত এই বইটি পরিবর্দ্ধিত হয়ে প্রকাশ হল

প্রত্যয় প্রকাশ প্রযত্নে : ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

‘মৌ-কা-সা-বি-স’-একবচন না বহুবচন ?

প্রেমেন্দ্র মিত্র

হ্যাঁ, সবুরে মেওয়া সত্যি সত্যিই ফলে।

বারে বারে না হোক দু’চারবার ত বটেই।

আমাদের বেলা কথাটা ভালোভাবে প্রমাণ হল প্রায় প্রতিটিবার।

প্রমাণ হল মৌ-কা-সা-বি-স এর চিঠির ব্যাপারে।

এ চিঠির ব্যাপারে এবারে আমিই একটু বেশী অস্থির হয়েছিলাম। মৌ-কা-সা-বি-স এর শেষ চিঠি এসেছিল সেই মাস ছয়েক আগে। ঘনাদাকে তাতাবার ব্যাপারে সোজাসুজি লক্ষ্যভেদ না করলেও তেরছাভাবে সেই চিঠি যথাস্থানে খোঁচা দিয়ে ঘনাদাকে দিয়ে মহাভারতের শল্য চরিত্রের নতুন ব্যাখ্যা বার করিয়ে ছেড়েছিল।

মৌ-কা-সা-বি-স এর কাছে এইটুকুর জন্যেই কৃতজ্ঞ হয়ে আমাদের একবারের জন্যে, অন্ততঃ একটু খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা করা কি উচিৎ ছিল না ?

কিন্তু গৌর শিশিরের তাতে ঘোরতর আপত্তি।

না, না, কখখনো না !—গৌরের শাসানি। আমাদের একটু নরম দেখলেই ওরা লেজে খেলতে শুরু করবে। কিন্তু, আমি একটু প্রতিবাদ না জানিয়ে পারলাম না।

—আমাদের দিক দিয়ে একটু সাড়া দেওয়া কি উচিত নয়। শেষে আমাদের গা নেই মনে করে ওরাও যদি কারবার বন্ধ করে দেয়। একেবারে ফুটো ঢাক’ত নয়। টঙের ঘরের ও’কে একটু আধটু নাড়াচাড়া দেবার মতো দু একটা প্যাঁচ বাৎলাবার চেষ্টা ত করেছে।

করেছে যেমন, তেমনি আবার করবে। —শিশির আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, আমরা সাড়া দিই বা না দিই, নাম যাদের মৌ-কা-সা-বি-স আমাদের মতো মক্কেল হাতে রাখবার গরজ তাদের খুব বেশী। সুতরাং অধীর না হয়ে শুধু লেটার বক্সটি দিনের পর দিন হাতড়ে যাও, এইত তোমাদের বিধান। শিবু তর্কটাকে আর বাড়াতে না দিয়ে মিটমাটের রাস্তায় গিয়ে বললে,—বেশ তাই মেনে নিলাম। কিন্তু মৌ-কা-সা-বি-স হঠাৎ ‘ওরা’ হয়ে বহুবচনের গৌরব কেমন করে পেল একটু যদি বুঝিয়ে বলো।

আরে তাইত ! আমার মতো সবাই বোধ হয় একটু চমকে উঠে ব্যাপারটা খেয়াল করল। ব্যখ্যা কিন্তু কারুর কাছে পাওয়া গেল না। এইটুকুই শুধু স্থির হল যে, এক বা অনেক যাই হোক, মৌ-কা-সা-বি-স এর গরজ আমাদের চেয়ে বেশী বই কম নয় ধরে নিয়েই আমরা ধৈর্য ধরে থাকব, আর তার ফল ফলবেই।

সত্যিই তাই বলল। হপ্তাখানেক না যেতে যেতেই শিবু সিঁড়ির নীচের লেটার বক্স খুলতে গিয়ে হঠাৎ যে উল্লসিত চিৎকারটা ছাড়ল নেহাৎ বিকেল বেলা তাঁর নিত্য নিয়মিত সরোবর সভার টানে বেরিয়ে না পড়ে থাকলে টঙের ঘর থেকে তিনি নিশ্চয়ই শশব্যস্ত হয়ে বিদ্যাসাগরী চটি পায়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটাতেন। শিবুর উল্লাস ধ্বনিটা অবশ্য হুর্‌রে জাতীয় দুর্বোধ্য কিছু। তার গলার দোষে সেটা আনন্দের না আর্তনাদের তা বোঝাও খুব সহজ নয়। অবশ্য আমরা ওপরের দালান থেকে ঠিকই বুঝলাম যে আমাদের ধৈর্ধ নিস্ফল হয়নি। আমাদের নীরবতায় অস্থির হয়ে মৌ-কা-সা-বি-সই নিজে থেকে প্রথমে পত্রাঘাত করেছে। চিঠি অবশ্য লম্বা কিছু নয়। দুচার ছত্রের মাত্র। তার ওপর বিদ্রুপের খোঁচাটাই প্রধান।

‘কি হে বাহাত্তর নম্বরের বালখিল্যেরা !

চিঠির প্রথমেই টিটকারি দেওয়া সম্ভাষণ। সেই সুরেই লেখা—

সবাই একেবারে ভোক্কাটা হয়ে গেছ মনে হচ্ছে ! টঙের ঘরের তাঁর লেঙ্গিতে বুঝি সবাই কাৎ। তা সুবুদ্ধি না নিলে কাৎ ত হবে এই। সেই মৌ-কা-সা-বি-স-এর কাছে হাত পাততে এখনো মান যায় বলে আর একটা ফাঁদ নিজে থেকেই বাৎলে দিচ্ছি। দিচ্ছি মিনি মাগনা। এ ফাঁদের ফাঁস ঠিক মতো টানতে পারলেই ষোল আনা বাজিমাৎ। সুড় সুড় করে নিজের গরজে এসেই ধন্না দেবে। দুনিয়ার সবাইকার হাহাকার কি নিয়ে ? হাইড্রো কার্বন। অতলে পাতালে নয়, সেই সাত সমুদ্রে সাত হাজার রাজার ধন নদী নালা পুকুর ডোবার কচুরী পানার মত জোলো ডাঙার আগাছায়। নাম ধরো কচুরী পানার ভাই কচালী ঝাঁটি। শুধু কচালীই বল না।

জলা বাদার বুনো আগাছা ত নয়, তার মধ্যে কুবেরের দৌলত খানা। কিন্তু সিন্ধুকে কুলুপ দেওয়া। সে কুলুপ কে খুলবে ? খোলার আঁক যে কষে প্রায় বার করে ফেলেছে গেয়ো যুগী বলে সে ভিখ্‌ পায় না।

ওদিকে রাক্কস খোক্কসদের দেশের দুশমনরা লোভে লোভে ঠিক এসে পড়েছে ‘কচালী’র মুল্লুকে।

‘কচালী’ কুলুপ খোলার মন্তর সমেত খোদ গুণী কারিগরকেই যারা এ মুলুক থেকেই পাচার করবার প্যাঁচ করেছে তার, কিছু জানেন আমাদের টঙের ঘরের তিনি। একটু খুঁচিয়েই দেখুন না !!’

ব্যস চিঠি ওই খানেই শেষ।

মৌ-কা-সা-বি-স এর নামে এ চিঠি কে পাঠিয়েছে - কে না কারা ? এ চিঠি নিয়ে কি করব আমরা এখন ?

আমরাও ভাবনায় পড়েছি। কিন্তু ঘনাদাকে খোঁচা দেবার মতো কোনো ফিকির এখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই

অজয় হোম	॥	বিচিত্র জীবজন্তু	১০·০০
এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়	॥	বিচিত্র বিজ্ঞান	৮·০০
বিমান বসু	॥	গ্রহ পরিচয়	১২·০০
সিদ্ধার্থ ঘোষ	॥	অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক	১০·০০
অরূপরতন ভট্টাচার্য	॥	রোবোট এল কেমন করে?	৬·০০
সমরজিৎ কর	॥	সমুদ্রের সম্পদ	৮·০০
অমরনাথ রায়	॥	নলেজ কুইজ	১০·০০
অরূপরতন ভট্টাচার্য	॥	যুক্তি তর্ক হেঁয়ালি	৮·০০
সমরজিৎ কর	॥	নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী	১৫·০০
পার্থসারথি চক্রবর্তী	॥	মাটি থেকে আকাশে	১০·০০
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	॥	পশু পাখী কীট পতঙ্গ	৮·০০
অমরনাথ রায়	॥	সংখ্যা নিয়ে খেলা	৮·০০
সিদ্ধার্থ ঘোষ	॥	লুইস ক্যারোলের ধাঁধা	১০·০০
অমরনাথ রায়	॥	জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা	৫·০০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	॥	পশুপক্ষী	২০·০০
অমরনাথ রায়	॥	সায়েন্স ক্যুইজ	১০·০০
অজয় হোম	॥	বাংলার পাখি	২০·০০
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	॥	বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার	৬·০০
স্বপনবুড়ো	॥	বুক অব নলেজ	১৫·০০

শৈব্যা ● প্রকাশন বিভাগ
কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান এর নতুন ঠিকানা
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

ট্রয়ের ঘোড়া

জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার

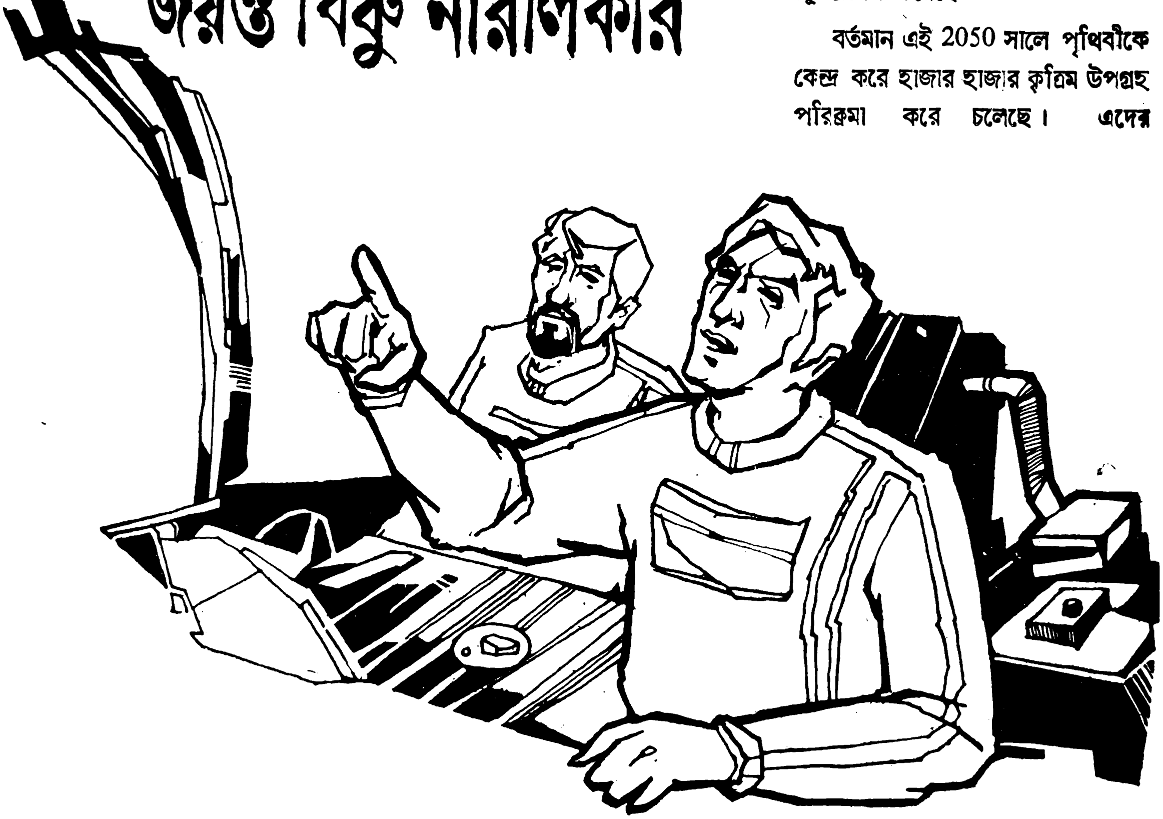

জ্যাকসনের সামনেকার কণ্ট্রোল প্যানেলের লাল আলোটা জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ওর কানে এল বীপ বীপ শব্দ। জরুরী স্পেস-সেন্সর উপগ্রহে দুরকমের ব্যবস্থাই করে রাখা হয়েছে।

পৃথিবীর চারপাশের মহাকাশের উপর সারাদিনরাত নজর রাখার দায়িত্ব হচ্ছে এই স্পেস-সেন্সর উপগ্রহের। পালা করে যে চারজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এ কাজ করেন জ্যাকসন তাদেরই একজন। এঁদের কাজ হচ্ছে পৃথিবীর চারপাশের মহাকাশের উপর নজর রাখা এবং অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তা পৃথিবীর কণ্ট্রোলরুমকে জানিয়ে দেওয়া। প্রত্যেক বিজ্ঞানী একনাগাড়ে সাড়ে ছ ঘণ্টা কাজ করেন। ছ'ঘণ্টা কেটে গেলে অন্য বিজ্ঞানী এসে কাজে যোগ দেন। একজনের কাজের শেষ আধঘণ্টা এবং অন্যজনের কাজের প্রথম আধঘণ্টা দুজনে একসঙ্গে কাটান। এর উদ্দেশ্য আর কিছুই না কাজটা যাতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে হয় তারই ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে যদি অস্বাভাবিক কিছু ঘটে তবেই। লাল আলো জ্বলে ওঠা এবং বিপবিপ শব্দ জানিয়ে দিচ্ছে যে পৃথিবীর মহাকাশে কোন অজানা বস্তু প্রবেশ করেছে।

বর্তমান এই 2050 সালে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার কৃত্রিম উপগ্রহ পরিক্রমা করে চলেছে। এদের বেশীরভাগের কথাই স্পেস-সেন্সর এর কমপিউটারের মেমারীতে ধরা আছে। কমপিউটার মেমারীতে নেই এমন কোন মহাকাশযান বা কৃত্রিম উপগ্রহ এই মহাকাশ এলাকায় ঢুকে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে এই দ্বৈত সংকেত কার্যকরী হয়ে ওঠে। অতীতে এরকম ঘটনা দু'একবার যে ঘটেনি তা নয়। অনেক সময় অনেক রাষ্ট্র কোন গোপন উদ্দেশ্যে কোন মহাকাশযান পাঠালে তা স্পেস-সেন্সরকে জানাতে চায় না। তবে এধরণের মহাকাশযানের খবর অবশ্যই ইউনাইটেড স্পেস ফেডারেশানকে জানাতে হয়। এবং ইউ এম এফ এধরণের মহাকাশযানের জন্য তাদের মূল বিশাল কমপিউটার মেমারীতে একটা গোপন লিস্ট করে রাখে। এই সংস্থা আন্তর্জাতিক এবং স্পেস-সেন্সর এর হেড-কোয়ার্টাস বলা যেতে পারে। স্পেস-সেন্সর বিপদ সংকেত পেলে তা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেয় স্পেস ফেডারেশানকে। স্পেস ফেডারেশান তাদের গোপন লিস্ট

মিলিয়ে যদি এর হদিশ পায় তো ভাল। তাহলে স্পেস সেন্সরের বিপদ-সংকেত স্বয়ংক্রিয়ভাবে থেমে যায় এবং এ বিষয়ে স্পেস সেন্সরকে আর মাথা ঘামাতে হয় না। কিন্তু যদি বিপদ সংকেত না থামে তাহলে? অতীতে অবশ্য এরকম ঘটনা কখনো ঘটে নি। যদি ঘটত, তাহলে সেই অজানা মহাকাশযানকে ধ্বংস করে ফেলার সম্পূর্ণ ক্ষমতা স্পেস ফেডারেশানের হাতে আছে।

জ্যাকসন স্পেস-ফেডারেশানে এই বিপদ সংকেতের কথা জানানোর পরেও সংকেত থামল না। তার বদলে জ্যাকসনের কণ্ট্রোল-প্যানেল টিভি পর্দায় ফুটে উঠল স্পেস ফেডারেশানের নির্দেশ: এটা একটি অজানা মহাকাশযান। পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা কর। সেই অস্বাভাবিক ঘটনার এই হল সূত্রপাত।

* * *   * * *

সহকর্মীদের ডাকল জ্যাকসন। গুপ্ত ও টাকেনো জেগে ছিল। ওরা এগিয়ে এল। নাগোভিচ তখনো ঘুমুচ্ছিল। জ্যাকসন ওদের পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে বলল, 'স্পেস ফেডারেশান পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই অজানা মহাকাশযানের হদিশ বের করার চেষ্টা করছে। কিন্তু যদি তা বের করতে না পারে...'

গুপ্ত উত্তেজিতভাবে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'তাহলে আমি ওটাকে সাবাড় করে দেব।' গুপ্তর এ কথা বলার হক আছে, কারণ জ্যাকসনের পর গুপ্ত আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কণ্ট্রোল-প্যানেলের ভার নেবে।

টাকেনো ঠাণ্ডা মাথায় বলল, 'ব্যস্ত হচ্ছ কেন? দেখা যাক না কি হয়?' টাকেনো কোন ব্যাপারেই কখনো মাথা গরম করে না।

* * *   * * *

জ্যাকসনের পাঠানো খবর কী সাংঘাতিক উত্তেজনার সৃষ্টি করল তা স্পেস ফেডারেশানের খুব মুষ্টিমেয় কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাই শুধু অনুভব করতে পারলেন। খবর পাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের মহাকাশ বিষয়ক ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের একটি সভা আহূত হল, এই অতি গোপনীয় অথচ গুরুতর বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য। (এই সব সভার আলোচনা হয় টিভির মাধ্যমে।)

সভাপতি মশায় একেবারে সময় নষ্ট না করে আসল বিষয়ে এসে পড়লেন, 'বন্ধুগণ! আমি একটি অস্বাভাবিক ঘটনার কথা আপনাদের বলতে চাই। স্পেস-সেন্সর-৬ আমাদের জানিয়েছে যে আমাদের মহাকাশে একটি অজানা মহাকাশযান ঢুকে পড়েছে। এই মহাকাশযান সম্পর্কে আমাদের মূল কম্পিউটারের কোন ধারণাই নেই। এই মহাকাশযানের দায়িত্ব কোন রাষ্ট্রই নেন নি। 22 বছর আগে যখন এই গোপন লিস্ট রাখার নিয়ম চালু করা হয়েছিল তারপর থেকে এরকম ঘটনা কখনো ঘটেনি। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমাদের খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে সেইভাবে কাজ শুরু করতে হবে।'

একজন প্রতিনিধি জানতে চাইলেন, 'এই অজানা মহাকাশযানের বর্তমান অবস্থান এবং কক্ষপথ সম্পর্কে জানতে পারি কি?'

'স্পেস সেন্সর-6 জানিয়েছে যে বর্তমানে মঙ্গল ও পৃথিবীর কক্ষপথের মাঝামাঝি জায়গায় ওটা পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছে। আমি কক্ষপক্ষ ও অন্যান্য তথ্য আপনাদের টিভি পর্দায় প্রতিফলিত করছি।' বলে সভাপতি ওর সামনেকার টারমিনালের কয়েকটা বোতাম টিপলেন।

প্রতিনিধিরা যখন টিভি পর্দায় মনসংযোগ করার চেষ্টা করছিলেন তখন একজন বিজ্ঞানী বলে উঠলেন, 'আমার মনে হচ্ছে মহাকাশযানটি আগামীকালের মধ্যে চাঁদের কক্ষপথ ছাড়িয়ে যাবে এবং কয়েকদিনের মধ্যে স্পেস-সেন্সর-6 এর খুব কাছাকাছি এসে পড়বে।'

সভাপতি মহাশয় খুব খুশি হয়ে বলে উঠলেন, 'আপনার কথাই ঠিক ডঃ সিং।' এই কম্পিউটারের যুগে মাথা ঘাটিয়ে অঙ্ক কষার মত লোকের খুবই অভাব। কিন্তু ডঃ সিং এর এই গুণটি আছে। অবশ্য একশ বছর আগে জন্মালেও উনি লোককে এই ভাবেই চমকে দিতে পারতেন। ওঁর এই দক্ষতা ওর সহকর্মীদের ঈর্ষার বস্তু। ডঃ সিংই পরবর্তী কর্মপদ্ধতির ইঙ্গিত দিলেন। উনি বললেন, 'আমাদের সামনে দুটো পথ খোলা আছে। প্রথমটি খুবই সোজা ও প্রত্যক্ষ। ওটাকে ধ্বংস করে ফেলা। কিন্তু একজন বিজ্ঞানী হয়ে এই পদ্ধতিতে আমার মন সায় দিচ্ছে না। আমি জানতে চাই কোথা থেকে এসেছে এই মহাকাশযানটি এবং কি আছে এর ভিতরে। ওটাকে ধ্বংস করলে কখনই আমরা এর উত্তর পাব না। তাই আমি বলতে চাইছি ওটাকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করা হোক। এটা যদি সৌরমণ্ডলের বাইরে থেকে এসে থাকে তাহলে আমরা অনেক কিছু জানতে পারব।'

'কিন্তু কাছে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করা খুব ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে নাকি?' সভাপতি মহাশয় যেন সবার মনের কথাটা বলে দিলেন। 'সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে ঝুঁকি না নিয়ে কোন উপায় নেই। ঝুঁকি নেওয়া হয়েছিল বলেই আমরা এতটা এগিয়ে আসতে পেরেছি। যাহোক খুব কাছে না গিয়েও দূর থেকেও এর ছবি তুলতে পারি আমরা রিমোট সেন্সিং টেকনিকের সাহায্যে।'

ডঃ সিং এর প্রস্তাব সমর্থন করলেন স্পেস-সেন্সর এর অধিকর্তা আর্ট জুমিনো। জুমিনো জানেন যে স্পেস সেন্সর এর ছেলেরা অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় এবং এই ব্যাপারে

তারা শুধু ছবি তুলেই ক্ষান্ত হবে না। অতএব স্পেস সেন্টর 6 কে নির্দেশ দেওয়া হল অজানা মহাকাশযানের ছবি তুলতে শুরু কর। এখন থেকে এই মহাকাশযানকে 'এক্স' নামে চিহ্নিত করা হবে বলে সভায় ঠিক হল।

* * *

জ্যাকসন বলে উঠল, 'গুপ্ত! তুমি খুব ভাগ্যবান, তুমি এতবড় একটা কাজের সুযোগ পেলে। আমাদের শুধু হা করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোন কাজ রইল না।'

'তা ঠিকই। নির্দেশটা এলো যখন আমার পালা চলছে।' কাজের জন্যে তৈরী হতে হতে জবাব দিল গুপ্ত। স্পেস-ক্যাপসুলে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, দুদিনের খাবার ও আত্মরক্ষার জন্য কিছু অস্ত্রশস্ত্র গুছিয়ে নিল ও। ক্যাপসুলে উঠতে উঠতে বলল গুপ্ত, বন্ধুগণ! খুব শীঘ্রই মহাবিশ্বের আগন্তুকদের ছবি তুলে ফিরে আসছি।' গুপ্ত চলে যেতেই টাকেনা স্পেস-সেন্টর 6 এর ভার নিল।

সপ্তাখানেকের মত মহাকাশ ভ্রমণে স্পেস-ক্যাপসুল গুলো *খুবই উপযোগী। এর জ্বালানী খরচ ও খুব কম। এর* মিনি-কমপিউটার ক্যাপসুল পরিচালনার ব্যাপারে খুবই দক্ষ। প্রায় 18 ঘণ্টা পরে গুপ্ত এক্স এর কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছুবে। এখন গুপ্ত ঘণ্টা আষ্টেক আরামে ঘুমিয়ে নিতে পারে।

টিভি পর্দায় এক্স এর চেহারা ফুটে উঠতেই গুপ্ত ক্যাপসুলের কক্ষপথ ঠিক করে নেওয়ার জন্য তৈরী হল। এক কিলোমিটার দূরত্বে গুপ্ত কক্ষপথ পালটে এক্স এর চারপাশে ঘোরার জন্য একটা কক্ষপথ বেছে নিল। এক্স তখন পৃথিবীর দিকে এগিয়ে চলেছে। এক্সকে পরিস্কার দেখতে পেল গুপ্ত। বর্তমানের মহাকাশযানের তুলনায় এক্স খুবই ছোট এবং এর নির্মাণ কৌশলও খুব উন্নত বলে মনে হল না ওর কাছে। ওটা ভাল করে দেখে গুপ্তর মনে হল এই মহাকাশযানটিকে আগে ও কোথাও যেন দেখেছে। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? গুপ্ত নিজেকে মনে মনে শক্ত করল। এসব আজেবাজে চিন্তার প্রশ্রয় দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। ও ছবিতোলার সাজসরঞ্জাম ঠিক করতে লেগে গেল।

* * *

'কি অদ্ভুত ব্যাপার!' গুপ্তর পাঠানো ছবিগুলো পরীক্ষা করতে করতে বলে উঠলেন ডঃ সিং। 'আপনারা কি এই মহাকাশযানটিকে চিনতে পারছেন?' জিজ্ঞাসা করলেন ডঃ সিং। সহকর্মীদের ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে আবার বলে উঠলেন ডঃ সিং, 'আরে, আপনারা আজকালকার ছেলেছোকরা ইতিহাসের তো কোন খোঁজই রাখেন না। রাখলে জানতে পারতেন। বন্ধুগণ! আমিই আপনাদের রহস্যটা ভেঙে বলছি। এই মহাকাশযানটি এখানে এই পৃথিবীতেই তৈরী করা হয়েছিল। এর নাম হচ্ছে পাইওনীয়র-10। পৃথিবী থেকে ছোঁড়া হয়েছিল - দাঁড়ান—দাঁড়ান—হ্যাঁ 1972 সালে। সৌরমণ্ডলের বাইরে থেকে ওটা আবার ফিরে এসেছে।'

এরপর সামনের টারমিনালের কয়েকটা বোতাম টিপলেন উনি। টিভি পর্দায় ফুটে উঠলো পাইওনীয়র-10 এর ভিতরে রাখা ফলকের ছবি। ডঃ সিং আবার বলতে শুরু করলেন, 'দেখুন আমাদের মহাকাশ মহাফেজখানা থেকে এই ঐতিহাসিক ফলকের ছবি যোগাড় করে এনেছি। সংবাদ সংকেতের জন্য এখানে বিনিয়ারী এ্যারিথমেটিক ব্যবহার করা হয়েছে। দূরত্ব বোঝাতে 21 সেঃমিঃ ওয়েভলেংথ অর্থাৎ সোজা কথায় বেতার তরঙ্গ যা কিনা ছায়াপথের সর্বস্তরে আছে তাই ব্যবহার করা হয়েছে। দিক বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে জানা 'পালসার'। এখানে অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার ভাষাকে ব্যবহার করা হয়েছে বিশ্বজনীন ভাষা হিসেবে, এই ভাষা বহির্বিশ্বের বুদ্ধিমান জীবদের বুঝতে মোটেও অসুবিধে হবে না।' তারপর টিভি *পর্দায় ফুটে ওঠা পাইওনীয়র-10 এর ছবির দিকে নির্দেশ করে* বলে উঠলেন ডঃ সিং, 'গুপ্তর পাঠানো ছবির সঙ্গে এ ছবির মিল যে কোন লোকই বুঝতে পারবে, তাই না?'

এক অদ্ভুত নীরবতা নেমে এলো গবেষণাগারে। এরপর একজন প্রশ্ন করল, 'কিন্তু পাইওনীয়র-10 কে পৃথিবীতে ফিরে আসার নির্দেশ যখন দেওয়া ছিল না, তখন কি করে ওটা ফিরে এলো?' সহকর্মীরা এতক্ষণে মনে মনে অনেকেই এই কথাটা ভাবছিলেন।

'বন্ধুগণ : পাইওনীয়র নিজে নিজে ফিরে আসেনি একথা জলের মত পরিষ্কার তাহলে কিভাবে এলো? যদিও কথাটা পাগলের প্রলাপের মত শোনাবে তবু বলতে হচ্ছে।' বলে ডঃ সিং একমুহূর্ত থামলেন। তারপর সবার মুখের দিকে তাকিয়ে শুরু করলেন, পাইওনীয়র 10 ফিরে এসেছে তার একমাত্র যুক্তিপূর্ণ কারণ হচ্ছে ওকে কেউ ফেরৎ পাঠিয়েছে। বহির্বিশ্বের বুদ্ধিমান জীবরা পাইওনীয়র 10 কে দেখতে পায়। ভিতরের ফলকের অর্থ উদ্ধার করে এবং আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয় তাদের বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে। দেখুন এক্সরে ছবিতে মহাকাশযানের ভিতর দেখা যাচ্ছে। ভিতরে বিপজ্জনক কিছুই নেই। আমার ধারণা, বহির্বিশ্বের আমাদের বন্ধুরা ওটা যে অবস্থায় ছিল ঠিক সেই অবস্থাতেই পৃথিবীতে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'কিন্তু কেন?'

'মজা করার জন্য হতে পারে। আপনারা সমস্ত তথ্য এখন ভালভাবে পরীক্ষা করুণ। আমি এবার ঘণ্টা চারেক ঘুমিয়ে নিইগো'।

ডঃ সিং হাই তুললেন। গত 24 ঘণ্টা দুচোখের পাতা এক করতে পারেন নি উনি। ডঃ সিং ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

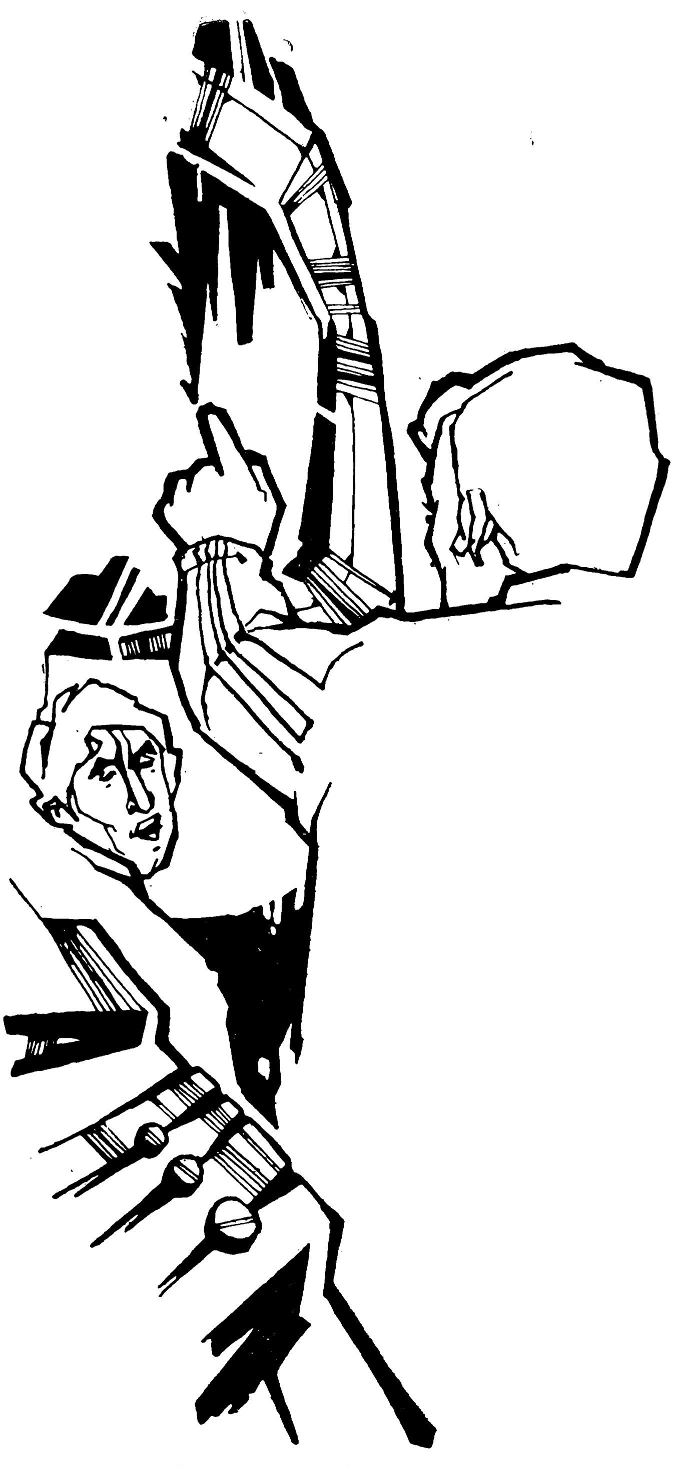

দেখুন এক্সরে ছবিতে মহাকাশযানের ভিতর দেখা যাচ্ছে।

* * *

ঠিক চার ঘণ্টা বাদে ডঃ সিং ঘুম থেকে উঠে পড়লেন। ঘুম থেকে উঠে গলেষণাগারের দিকে পা বাড়াতেই ডঃ সিং এর দশবছরের ছেলে এসে ওঁকে ধরল। 'বাবা, ট্রয়ের ঘোড়া মানে কি? আমি একটা গপ্পে কথাটা দেখলাম, কিন্তু কথাটার মানে ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবে?'

'সেতো বিরাট লম্বা কাহিনী সোনা। পরে আমি তোমাকে পুরোটা বিশদভাবে বলব। সংক্ষেপে, গ্রীকদের ট্রয় বিজয় এর কাহিনীর সঙ্গে কথাটা যুক্ত। বহু যুদ্ধের পরও যখন গ্রীকরা ট্রয় জয় করতে পারল না তখন ওরা একটা ফাঁদ পাতল। একটা কাঠের বিশাল ঘোড়া তৈরী করে ট্রয় নগরের বাইরে রেখে ওরা চলে গেল। ট্রয়বাসীরা ঘোড়াটা দেখে নগরের মধ্যে নিয়ে গেল। রাতে ঘোড়ার ফাঁপা পেটের ভিতর থেকে দলে দলে যুদ্ধবাজ সৈনিকরা বেরিয়ে ট্রয় নগরী জয় করে ফেলল।'

'ও তাহলে ট্রয়ের ঘোড়া কথাটার মানে হচ্ছে শত্রুকে বুঝতে না দিয়ে তাদের এলাকায় ঢুকে পড়ে তাদের ধ্বংস করা তাই না বাবা।

'ঠিক বলেছ সোনা। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে, চলি। পরে, পুরো গপ্পটা বলব কেমন।' বলে ডঃ সিং গবেষণাগারের দিকে ছুটলেন। কিন্তু যেতে যেতেই ওঁর মনের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর চিন্তার জন্ম হল।

* * *

আর একটা জরুরী সভা শুরু হয়ে গেছে এমন সময় ডঃ সিং গবেষণাগারে গিয়ে পৌঁছুলেন।

'ডঃ সিং। অভিনন্দন গ্রহণ করুণ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার জন্য আমরা পাইওনীয়র-10 কে ফিরে পাচ্ছি। আপনার কথা না শুনলে আমরা এরকম একটা ঐতিহাসিক মহাকাশযানকে ধ্বংস করে ফেলতাম। একটু আগেই আমরা আলোচনা করছিলাম কি করে এখন ওটাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা যায়। এরকম একটা ব্যাপারের পর আমরা একটু আমোদস্ফূর্তি করতে চাই।'

সভাপতিমহাশয় এত সহজে থামতেন না। কিন্তু ডঃ সিং-এর মুখের দিকে তাকিয়ে ওঁর মনে হল ডঃ সিং যেন কিছু বলতে চান তাই থামলেন উনি। 'স্যার! আপনারা আমার কথা শুনেছিলেন তার জন্য আমি আপনাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনারা যদি আর একবার আমার কথা রাখেন তাহলে আমি আপনাদের কাছে আরো কৃতজ্ঞ থাকব। মহাশয়গণ! পাইওনীয়র-১০কে পৃথিবীতে নামিয়ে নিয়ে আসার আগে আমাদের ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে ওটা থেকে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।'

'কিন্তু আপনার কথামত আমরা ওটার প্রচুর ছবি তুলেছি। আপনি যদি চান আমরা আরো কিছু ছবি তুলতে পারি। গুপ্ত এখনো মহাকাশযানটির কাছাকাছিই আছে।' সভাপতিমশায়কে আবার বাধা দিলেন ডঃ সিং।

'না স্যার! নতুনভাবে পরীক্ষা চালাতে হবে। যেহেতু আমাদের হাতে সময় খুবই কম, তাই আপনার অনুমতি না নিয়েই আমি টাকেনাকে নতুন পরীক্ষার জন্য রওনা হতে বলে দিয়েছি। ও ছবি তুলবার জন্য ইলেকট্রন বীম ব্যবহার করবে।'

'তা এভাবে ছবি তুললে আমরা কি বুঝতে পারব? আমরা আগেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ব্যবহার করেছি যা ইলেকট্রন বীম থেকে যথেষ্ট শক্তিশালী।' একজন প্রতিনিধি বলে উঠলেন।

'এই দুই পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট ফারাক আছে। আমাদের এই নতুন পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পারব ওই অজানা মহাকাশযানটি সত্যি সত্যি পাইওনীয়র-10 কিনা?'

'সেকি? পাইওনীয়র-10 ছাড়া ওটা আর কি হতে পারে?' প্রতিনিধিটি রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে বললেন।

'হতে পারে ট্রয়ের ঘোড়া।' একটু হেসে জবাব দিলেন ডঃ সিং। চারপাশের মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারলেন এঁরা কেউই গ্রীক ক্লাসিক পড়েন নি। তবে ডঃ সিং-এর আর এখন ও ব্যাপারে আলোকপাত করার মত মনের অবস্থা নয়। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সভাপতিমশায়ের সামনের টেলিফোনটা বেজে উঠল। ফোন তুলে মন দিয়ে শুনলেন। তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে বলে উঠলেন 'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ! এইমাত্র আমি টাকেনোর সঙ্গে কথা বললাম। ও বলছে যে ইলেকট্রন বীম দিয়ে যে ছবি তোলা হয়েছে তাতে কোন ছবি ওঠে নি। সম্পূর্ণ কালো।' সবাই তাকালেন ডঃ সিং-এর দিকে।

'যা ভয় করেছিলাম, ঠিক তাই।' ডঃ সিং আর উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছিলেন না।

'বন্ধুগণ! ওটা আমাদের পাইওনীয়র-10 নয়। সম্পূর্ণ এ্যান্টি-ম্যাটার দিয়ে তৈরী ওটা আসল পাইওনীয়র-১০ এর একটি হুবহু নকল। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ-এর সাহায্যে ম্যাটার ও এ্যান্টি-ম্যাটারের পার্থক্য ধরা পড়ে না। তাই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক-ওয়েভের সাহায্যে তোলা ছবি দেখে আমরা ধরে নিয়েছিলাম মহাকাশযানটি আমাদেরই ঐতিহাসিক পাইওনীয়র-১০। কিন্তু ইলেকট্রন বীম দিয়ে ছবি তুলতে গিয়ে দেখা গেল ছবি উঠল না। তার কারণ ইলেকট্রন-বীম মহাকাশযানের ভিতর ঢুকতে পারল না। কিছুতে আটকে গেল। কি সেই বস্তু? খুব সম্ভবতঃ মহাকাশযানের চারপাশে একটা ফোর্ণ-ফিল্ড রয়েছে। সেই ফোর্ণ-ফিল্ড মহাকাশযানের এ্যান্টি-ম্যাটারের সঙ্গে বাইরের জগতের ম্যাটারের যোগাযোগ ঘটতে দিচ্ছে না।'

'এ্যান্টি-ম্যাটার!' সভার চারদিক থেকে বিস্ময়সূচক শব্দটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।

'সে তো আমাদের পক্ষে মারাত্মক ব্যাপার।' মন্তব্য করলেন সভাপতিমশায়।

'ঠিক তাই। ওই ছদ্মবেশী মহাকাশযানটিকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে ওর ফোর্ণ-ফিল্ড স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নষ্ট হয়ে যেত এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা শেষ হয়ে যেতাম! শুধু মানুষ নয়, পৃথিবীর সব জীবন মুহূর্তে শেষ হয়ে যেতো। এ্যান্টি-মাটারের সঙ্গে ম্যাটার যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে সবকিছু নিঃশেষে মুছে যেত যা মানুষের সৃষ্ট পারমাণবিক অস্ত্র কখনই সেভাবে সবকিছু ধ্বংস করতে পারত না। না, মহাশয়, এই ছদ্মবেশী ভয়াবহ অস্ত্রটি কখনই কোন বন্ধুর কাছ থেকে আসেনি। একে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধ্বংস করে ফেলুন।' একটানা কথা বলে থামলেন ডঃ সিং।

'ট্রয়ের ঘোড়া' তার লক্ষ পূরণে ব্যর্থ হল। ছদ্মবেশী পাইওনীয়র-10কে মহাকাশের আরো গভীরে টেনে নিয়ে গিয়ে ধ্বংস করা হল। সেই ভয়াবহ দৃশ্য দিনের আলোয়, খালি চোখেও দেখা গেল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় পৃথিবীর সাধারণ মানুষ এই ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা জানতেও পারল না।

'উঃ কি সাংঘাতিক ব্যাপার! ডঃ সিং এই গ্রহটিকে বাঁচাবার জন্যে আমার ব্যক্তিগত অভিনন্দন গ্রহণ করুন।' সভাপতিমশায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

কিন্তু ডঃ সিং-এর অস্বস্তি গেল না। গ্রহটা আপাততঃ বেঁচে গেল ঠিকই, কিন্তু এই আনন্দ যদি ক্ষণস্থায়ী হয় তাহলে? 'ট্রয়ের ঘোড়া' অকৃতকার্য হল বলে যদি ওরা হাত গুটিয়ে না নেয়?

নিরঞ্জন সিংহ

7/4, W2C পেস-II গলফ গ্রীন, কলি-47

[ভারতের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার 16-22 অক্টোবর 1983 সংখ্যা 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলী' পত্রিকায় 'দি ট্রোজান হর্স' নামে একটি সুন্দর ও অভিনব বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প লিখেছেন। মূল গল্পটি প্রথমে উনি লেখেন মারাঠী ভাষায়। গল্পটির ইংরেজী অনুবাদ লেখক নিজেই করেছেন ইলাস্ট্রেটেড উইকলী পত্রিকার জন্য। এই সুন্দর গল্পটি 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে'র জন্য ইংরেজী থেকে ভাষান্তরিত করেছেন নিরঞ্জন সিংহ]

উগ্রবিষ সাপ গোখরো

বিকাশকান্তি সাহা

ফণাধর সাপ। ফণার ওপর গোরুর খুরের মতো চিহ্ন—তাই গোখরো নাম। বাসস্থান ও প্রকার ভেদে এর অনেক আঞ্চলিক নাম—খরিশ, তম্প, কালী, তেঁতুলে খয়ে গোখরো, নাগ সাপ ইত্যাদি। ইংরেজি নাম—ইণ্ডিয়ান কোবরা (Indian Cobra)। বৈজ্ঞানিক নাম নাজা নাজা নাজা (Naja Naja Naja)।

এরা লম্বায় হয়ে থাকে প্রায় 1 মিটারের মতো। পুরুষ গোখরো মেয়ে গোখরোর তুলনায় লম্বায় বড় হয়। সুদৃশ্য ফণা এদের। ফনার নিচে দু'পাশে কালো গোল ফুটকি থাকে। গায়ের রং সাধারণত বাদামী বা হলুদ, কালো বা লালচে ; তবে বেশ চকচকে। ঘাড়ের নিচে—মাঝ শরীরে গোটাকতক কালো পটি (Band) থাকে ; কখনো কখনো সারা শরীর জুড়ে ফুটকি বা চেক প্যাটান'ও দেখা যায়। পেটের দিকটা হয় সাদা বা হলদেটে রঙের।

সারা ভারতে এদের দেখা মেলে। ধানের মাঠ, ইঁদুরের গর্ত, পোড়ো বাড়ি, উইয়ের ঢিবি ইত্যাদি হল গোখরোর প্রিয় বাসস্থান।

দ্রুতগতি সম্পন্ন—অতি সজাগ সাপ। বিপদের কোনো সংকেত পেলেই এরা হিস্ হিস্ আওয়াজ করে থাকে।

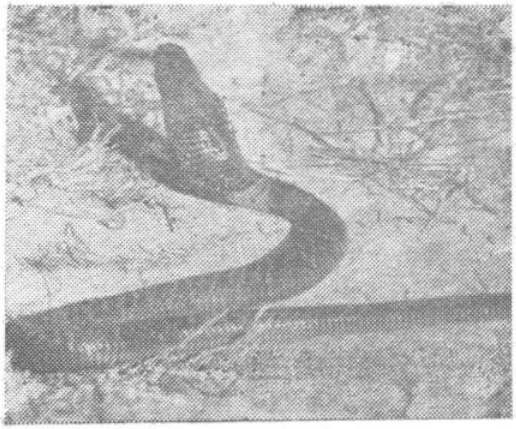

ব্যাং, ইঁদুর, পাখি, গিরগিটি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি এদের প্রিয় খাবার। এরা কখনো কখনো সাপও খেয়ে থাকে।

স্ত্রী-গোখরো মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে ডিম পাড়ে। স্ত্রী-গোখরোই ডিমে তা'দেয়।

সাপেরা কতদিন বাঁচে এ ব্যাপারে এখনও সঠিক কিছু জানা যায় নি। তবে এক তথ্য থেকে জানা যায়, 'লিন্‌কন্ পাক' জু'তে একটি গোখরো 21 বছর 6 মাস বেঁচেছিল।

গোখরোর দংশনে বিষক্রিয়া শুরু হয় স্নায়ুতন্ত্রে। বিষের তীব্রতা অনুযায়ী প্রত্যেক, বিষধর সাপের বিষের একটা নির্দিষ্ট বিপদমাত্রা (Lethal does) আছে' যার থেকে কম পরিমাণ বিষ রক্তে মিশলে রোগী প্রাথমিকভাবে অসুস্থ হলেও বিষক্রিয়ায় তার মৃত্যু হবে না ; দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতায় (Power of resistance) সমূহ বিপদ প্রতিহত হবে। উল্লেখ্য যে, মানুষের ক্ষেত্রে গোখরোর বিষের বিপদমাত্রা প্রায় 2 ফোঁটা।

C/o ডাঃ শান্তিগোপাল সাহা, রায়দীঘি গ্রামীন হাসপাতাল,
রায়দীঘি, 24 পরগনা।

পরিবেশ দূষণে ক্যান্সার হতে পারে.

মিহির সরকার

প্রতিদিন আমরা সবুজ অরণ্য নিধন করে চলেছি আধুনিক সভ্যতার খিদে মেটাতে। বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রতি বছর বিশ্বে 11·5 মিলিয়া হেক্টর বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে। আর এই সঙ্গে নগর প্রতিদিন তার দেহের পরিধি বাড়াচ্ছে। গড়ে উঠছে নতুন নতুন শিল্পাঞ্চল। নগরের বিভিন্ন যান-বাহনের ধোঁয়া এবং শিল্পাঞ্চলের কলকারখানার কালো ধোঁয়া প্রতিদিন জমা হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে। সেই সঙ্গে বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড জমা হচ্ছে। তাই আজ বিশ্বের সব শহরই বলা যায় বৃক্ষহীন এক রুক্ষ শহর। সবুজ বৃক্ষ নেই বলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের খুব মজা। কারণ, আমরা জানি একমাত্র গাছ, সবুজ পাতার সাহায্যে কার্বণ-ডাই-অক্সাইড গিলে খেয়ে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন ত্যাগ করে। সেই অক্সিজেন বায়ু মণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। আর এই অক্সিজেন আমরা শ্বাসের সাথে গ্রহণ করে বেঁচে আছি।

জলাভূমি থেকেও প্রতিনিয়ত অক্সিজেন আসে। কলকাতা শহরের কথাই ভাবা যাক। এই শহরের পূর্ব দিকে সল্ট লেক নামে এক অভিজাত অঞ্চল জলা জমি ভরাট করে গড়ে উঠছে। ফলে প্রতিদিন হারাতে হচ্ছে প্রায় ৪৪000লিটার অক্সিজেন। শহরের আশে পাশে জলা জমি ভরাট করে গড়ে উঠছে বিভিন্ন কলকারখানা। এর ফলে যেমন প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন খোয়াতে হচ্ছে তেমনি কলকারখানার ধোঁয়ায় প্রতিনিয়ত বায়ুমণ্ডলে বৃদ্ধি পাচ্ছে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ।

বায়ু মণ্ডলে মোট অক্সিজেনের শতকরা 90 ভাগ আসে সমুদ্রের বুক থেকে। সামুদ্রিক উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় জলের অনু (H_2O) ভেঙ্গে বাতাসে অক্সিজেন যোগ করে। কিন্তু, বায়ুমণ্ডলে অধিক পরিমাণে জমে থাকা কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং সালফার-ডাই-অক্সাইড-এর সঙ্গে বাতাসের জলীয় বাষ্পের বিক্রিয়ায় নির্মিত হচ্ছে যথাক্রমে কার্বলিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিড। এই সব অ্যাসিড নদী ও সমুদ্রের জলে গিয়ে মিশছে। বাড়ছে নদী ও সমুদ্রের জলের অম্লতা। ক্ষতি হচ্ছে জলজ শৈবাল ও অন্যান্য সামুদ্রিক উদ্ভিদের। ফলে অক্সিজেনের উৎপাদন তথা সরবরাহ কমতে শুরু করেছে।

আজ তাই বায়ু মণ্ডলে অক্সিজেনের টান পড়েছে। বর্তমানে বায়ু মণ্ডলে অক্সিজেনের ভাগ মাত্র 19·9 শতাংশ। ফলশ্রুতি পরিবেশ দূষণ।

পরিবেশ দূষণের ফলে শহর এবং শিল্পাঞ্চলের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কলকাতার মানুষের সারা বছরই সর্দি, কাশি এবং বিভিন্ন শ্বাস রোগ লেগেই আছে। কাছেই শিল্প নগরী দূর্গাপুরে শতকরা 80 ভাগ মানুষের ক্রনিক সর্দি, কাশি, অ্যালার্জি এবং হৃদযন্ত্র বিকল হওয়া, খুব স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দূর্গাপুরের বাতাস পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং লেড অক্সাইডের পরিমাণ সর্বাধিক।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মের পেছনে দূষিত পরিবেশের ভূমিকা নেহাৎ কম নয়। পরিবেশ দূষণের ফলে মানুষের জিন ও ক্রোমোজমের ক্ষতি হয়। আর সে বিপদের ঘণ্টা বাজাতে দূষিত পরিবেশ প্রস্তুত হচ্ছে তা শুনলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

সমুদ্র পৃষ্ঠের 10 কি. মি. থেকে 20 কি. মি. উপরে বায়ু মণ্ডলে "ওজন" (O_3) নামে এক গ্যাস স্তর আছে। এই গ্যাস স্তরের কাজ সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিকে পৃথিবীর বুকে না নামতে দেওয়া অথবা শোষণ করে নেওয়া।

সূর্য্যের অতি-বেগুনি রশ্মি মানুষের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। পৃথিবীর বুকে নানান জীবাণু জড়াতে ওস্তাদ। আর এই রশ্মি পৃথিবীর বুকে যত নেমে আসবে ততবেশী ক্যান্সার রোগ মানুষের মধ্যে দেখা দেবে। বায়ু দূষণের ফলে এই "ওজন" স্তরের ক্ষয় দেখা দিতে পারে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন "ওজন" স্তরের শতকরা 8 ভাগ ক্ষতি মানে প্রায় 8 হাজার ক্যান্সার রোগের বৃদ্ধি। আশার কথা এখনও "ওজন" স্তরের তেমন বিশেষ ক্ষতি হয় নি। কিন্তু যে হারে বায়ু দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে "ওজন" স্তরের ক্ষয়ের সম্ভাবনা আছে।

বিধানগড়, কলিকাতা-66

অক্ষবিহীন গ্রাফ

অসিতকুমার চক্রবর্তী

তোমরা অনেকেই গ্রাফ তথা লেখচিত্রের সঙ্গে পরিচিত। গ্রাফ আঁকার পদ্ধতিও অনেকেই জানো। কিন্তু এটা কি জানো গ্রাফ-কাগজ এবং X ও Y-অক্ষ না ব্যবহার করেও কয়েক রকমের গ্রাফ আঁকা যায়! এই ধরণের দুটি গ্রাফ হল বারগ্রাফ এবং পাইগ্রাফ।

বার-গ্রাফ (Bar Graph) ব্যবহার করা হয় তখনি যখন দুই বা তার অধিক দলের মধ্যে একইপ্রকার বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বিচার করা হয়। ধর, কলকাতা শহরের কোন একটি (A) পাড়ায় 65% হিন্দু, 30% মুসলমান এবং 5% খৃষ্টান বাস করে। অন্য আরেকটি (B) পাড়ায় 60% হিন্দু, 20% মুসলমান এবং 20% খৃষ্টান আছে। এছাড়া (C) পাড়ায় 50% হিন্দু, 10% মুসলমান এবং 40% খৃষ্টান আছে। এখন এই তথ্যগুলিকে আমরা Bar অর্থাৎ স্তম্ভের আকারে চিত্ররূপ দিতে পারি। আমরা X-অক্ষে শহরের পাড়াগুলি অর্থাৎ A, B ও C কে এবং Y-অক্ষে অধিবাসীদের শতকরা হারটি বসিয়ে বারগ্রাফটি আঁকতে পারি। এই বারগ্রাফ থেকে অনায়াসেই আমরা বিভিন্ন পাড়ার বিভিন্ন অধিবাসীদের শতকরা হারের একটা সুস্পষ্ট তুলনামূলক পরিচয় পেতে পারি।

এবারে আরেকটি মজার গ্রাফের কথা বলছি। এটি হল পাই গ্রাফ (Pie-graph) 'পাই' শব্দটার মানেই হ'ল গোলাকৃতি পিঠ। তাহলে বুঝতেই পারছো পাই-গ্রাফের ছবিটি নিশ্চয় বৃত্তাকার হবে। যেহেতু এই গ্রাফটি বৃত্তাকার সেহেতু এই গ্রাফ আঁকার জন্যে আমাদের কোনো ছক কাগজ যেমন দরকার নেই তেমনি কোনো দরকার নেই X-অক্ষ Y-অক্ষগুলোর।

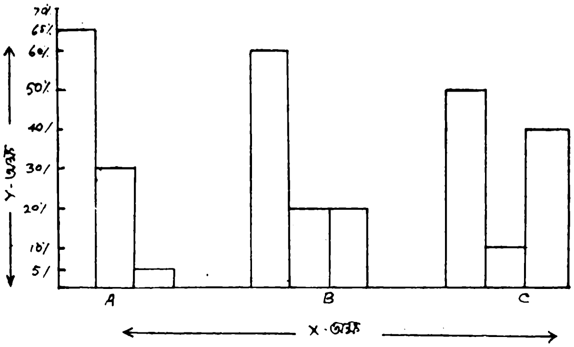

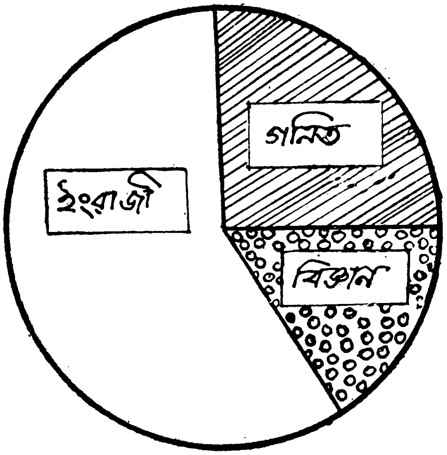

পাইগ্রাফে তথ্যগুলিকে বৃত্তের ভিতরস্থ ক্ষেত্রে মাপ অনুযায়ী বসানো হয়। তোমরা নিশ্চয়ই জানো বৃত্তের কেন্দ্রের চারদিকের কোণের পরিমাণ 300°। এইজন্যে যে কোন বৃত্তের অন্তর্গত ক্ষেত্রটাকে 360টি কোণে ভাগ করা যায়। যখন পাই-গ্রাফ আঁকা হয় তখন মোট সংখ্যাকে বৃত্তের অন্তর্গত ক্ষেত্রের সমান বলে ধরা হয়। এইবার প্রতিটি সংখ্যাকে এই 360° র অংশরূপে ভাগ করা হয়। মনে কর তোমার ক্লাশের 60% ছাত্র ইংরাজীতে ভাল, 25% গণিতে ভাল এবং 15% বিজ্ঞানে ভাল। এই তথ্যগুলির সাহায্যে পাই-গ্রাফ আঁকতে হবে।

প্রথমেই আমাদের হিসেব করে দেখতে হবে মোটসংখ্যা কত। এখানে মোটসংখ্যা হ'ল 60% + 25% + 15% অর্থাৎ 100% এই 100% বৃত্তটার সমগ্র অংশকে আবৃত করবে অর্থাৎ 360°র সমান হবে। এখন 100% যদি 360°-র সমান হয় তাহলে, ইংরাজীর ভাল 60%, সমান হবে 216°-র সঙ্গে গণিতে ভাল 25%, সমান হবে 90°-র সঙ্গে এবং বিজ্ঞানে ভাল 15% সমান হবে 54°-র সঙ্গে এইবার একটি বৃত্ত এঁকে বৃত্তটার অন্তর্গত ক্ষেত্রকে একটি চাঁদার সাহায্যে 216°, 90° এবং 54° অংশে বিভক্ত করা হ'ল। এই তিনটি ভাগের অন্তত ক্ষেত্রগুলির মধ্যে আমরা আমাদের সুবিধার জন্যে তথ্যগুলিকে লিখে দিতেও পারি। বৃত্তের এই গ্রাফকে পাই-গ্রাফ বলে।

ব্লক-2, ফ্ল্যাট-10
247, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলিকাতা-700 033।

সেই ছোটবেলা থেকে আমরা মশা দেখছি। মশার কামড় খাচ্ছি, চড় চাপড়ে মশা মারছিও অনেক। এত ছোট দেখতে—কিন্তু এর কামড়ের জ্বালা ভয়ানক। আবার এই মশাকেই জনৈকা পক্ষিবিজ্ঞানী 'সুন্দর পাখি' বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শুধু চোখে দেখে মশাকে আমরা আর কতটুকু বুঝতে পারি ?

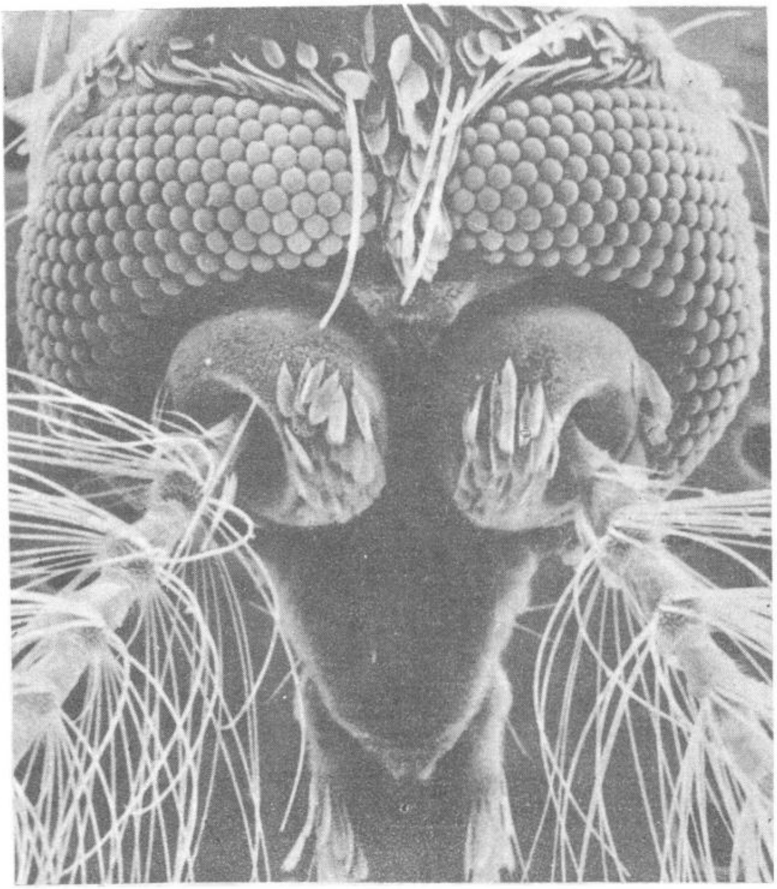

ছবি : বিমান বসু

উপরের ছবিটি কিসের বলতে পারো ? ভাবতে অবাক লাগে ছবিটি একটি মশার মাথার। দুটো শুঁড় দুদিকে বেরিয়ে রয়েছে। শুঁড়ের সংগে লেগে রয়েছে অসংখ্য রোঁয়া। আর ঠিক শুঁড়ের ওপরেই অসংখ্য গোলগোল সাজানো গুলিগুলো হল মশার চোখ বা পুঞ্জাক্ষি। যা খালি চোখে আমরা ভাবতেই পারি না। 'স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ'—আধুনিক বিজ্ঞানের একটি আশ্চর্য আবিষ্কার। এতে ব্যবহার হয় আলোর বদলে ইলেকট্রন কণা। কাচের লেন্সের বদলে এতে আছে তারের কয়েল। এতে ছবি ফুটে ওঠে টেলিভিশনের পর্দায়। এ এক আশ্চর্য অজানা জগৎ। যার হদিশ আগে কেউ পায়নি। স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপে একটি মশার মাথাকে ২০০ গুণ বড় করে দেখানো হয়েছে।

খোঁজ খবর

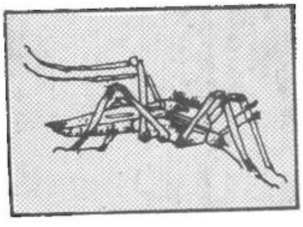

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

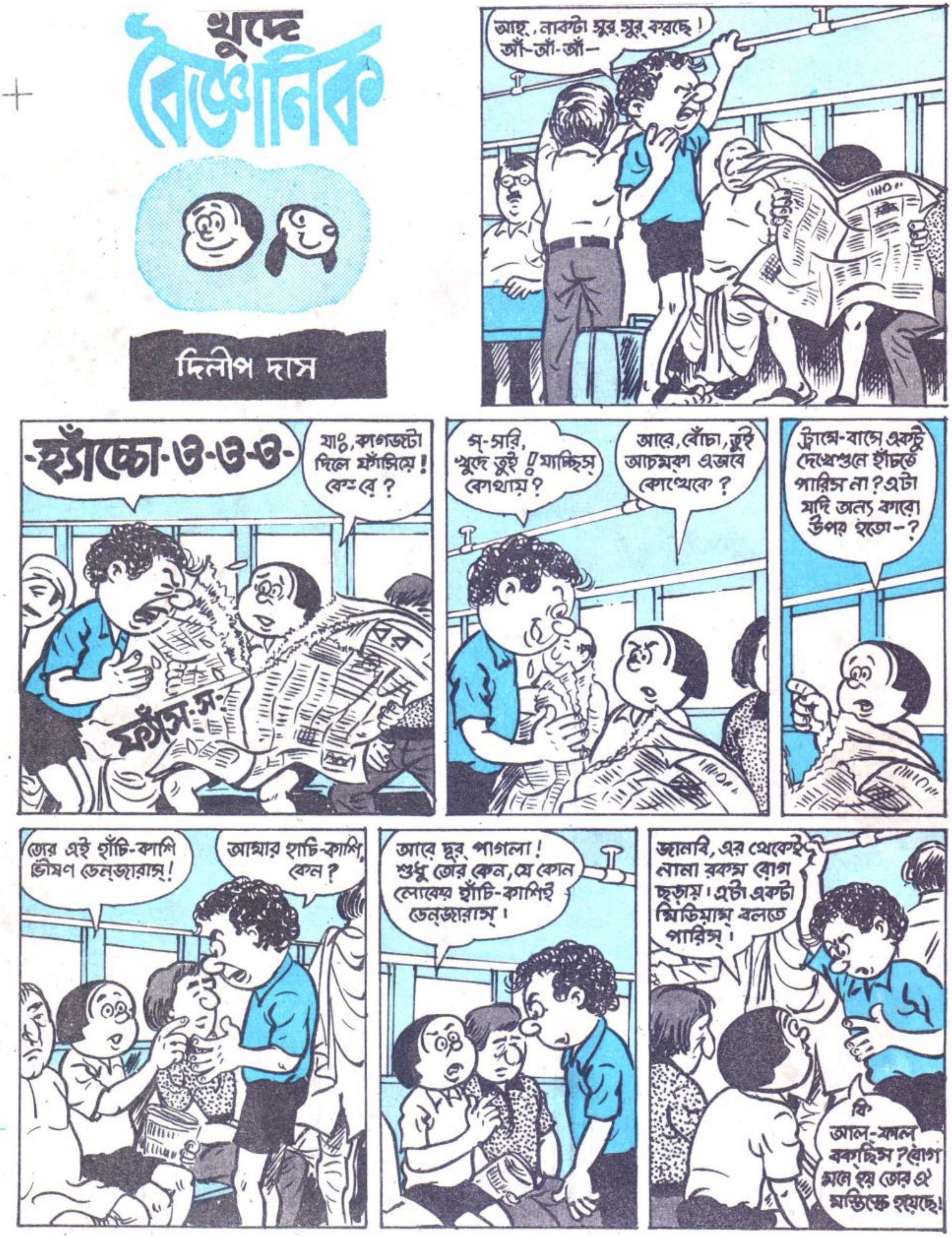
আহ্, নাকটা সুর্ সুর্ করছে!
আঁ-আঁ-আঁ—
-হ্যাঁচ্চো-ও-ও-ও-
যাঃ, কাগজটা দিলে ফাঁসিয়ে! কে-রে?
ফ্যাঁস-স-স
স্-সরি,
খুদে তুই! যাচ্ছিস্ কোথায়?
আরে, বোঁচা, তুই আচমকা এভাবে কোত্থেকে?
ট্রামে-বাসে একটু দেখেশুনে হাঁচতে পারিস না? এটা যদি অন্য কারো উপর হতো—?
তোর এই হাঁচি-কাশি ভীষণ ডেন্‌জারাস্!
আমার হাচি-কাশি, কেন?
আরে দূর্ পাগলা! শুধু তোর কেন, যে কোন লোকের হাঁচি-কাশিই ডেন্‌জারাস্।
জানবি, এর থেকেই নানা রকম রোগ ছড়ায়। এটা একটা মিডিয়াম্ বলতে পারিস্।
কি আল-বাল বক্‌ছিস? রোগ মনে হয় তোর ঐ মস্তিষ্কে হয়েছে!

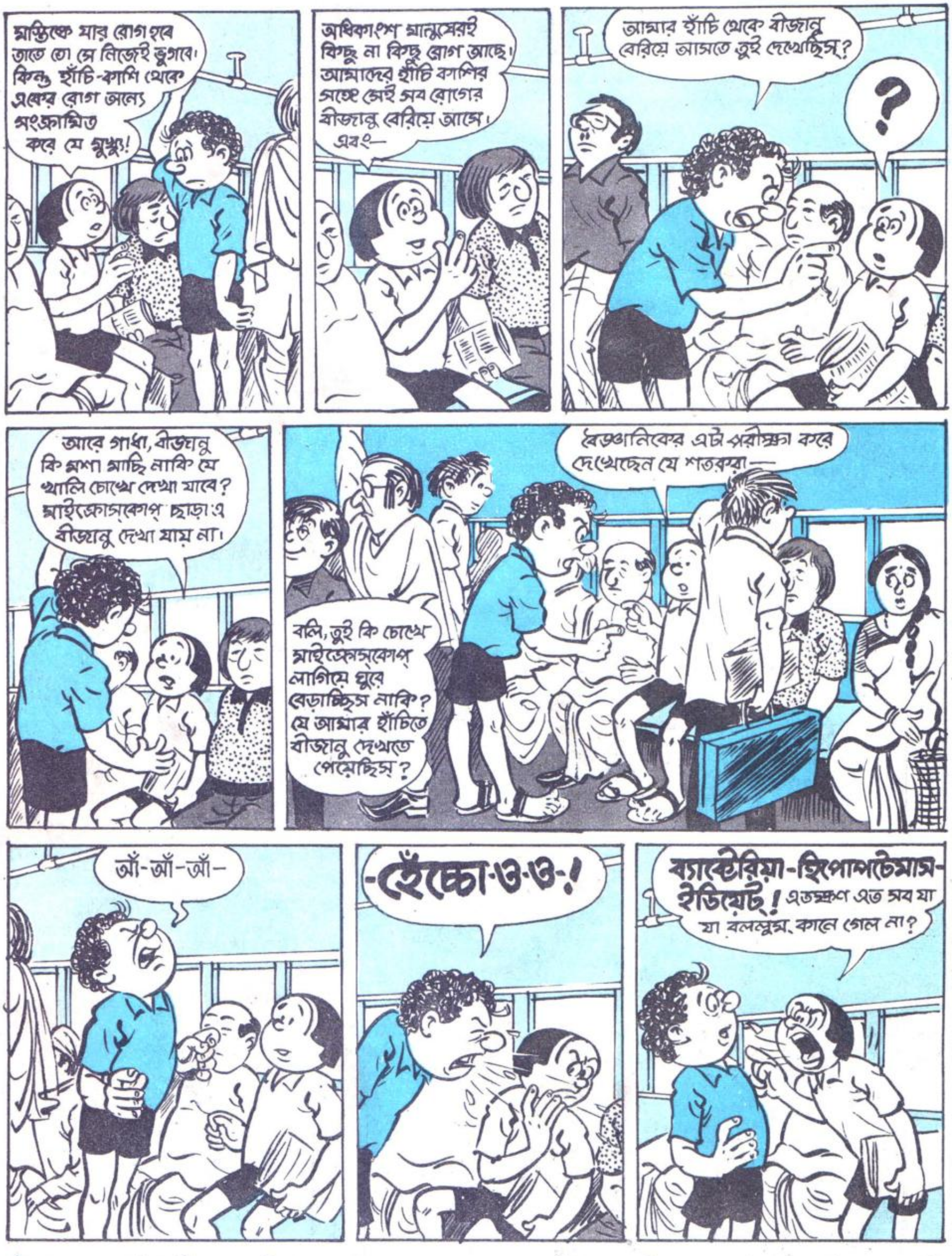
মস্তিষ্কে যার রোগ হবে তাতে তো সে নিজেই ভুগবে। কিন্তু হাঁচি-কাশি থেকে একের রোগ অন্যে সংক্রামিত করে যে মুখ্যু!
অধিকাংশ মানুষেরই কিছু না কিছু রোগ আছে। আমাদের হাঁচি কাশির সঙ্গে সেই সব রোগের বীজাণু বেরিয়ে আসে। এবং—
আমার হাঁচি থেকে বীজাণু বেরিয়ে আসতে তুই দেখেছিস?
?
আরে গাধা, বীজাণু কি মশা মাছি নাকি যে খালি চোখে দেখা যাবে? মাইক্রোস্কোপ ছাড়া এ বীজাণু দেখা যায় না।
বৈজ্ঞানিকেরা এটা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে শতকরা—
বলি, তুই কি চোখে মাইক্রোস্কোপ লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস নাকি? যে আমার হাঁচিতে বীজাণু দেখতে পেয়েছিস?
আঁ-আঁ-আঁ-
-হেঁচ্চো-ও-ও-!
ব্যাক্টেরিয়া-হিপোপটেমাস-ইডিয়েট্! এতক্ষণ এত সব যা যা বললুম, কানে গেল না?

☆ এর পর খুদে বৈজ্ঞানিক নুতন কি চমক দেখালো জানতে হলে পরবর্তী সংখ্যা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রাখ।

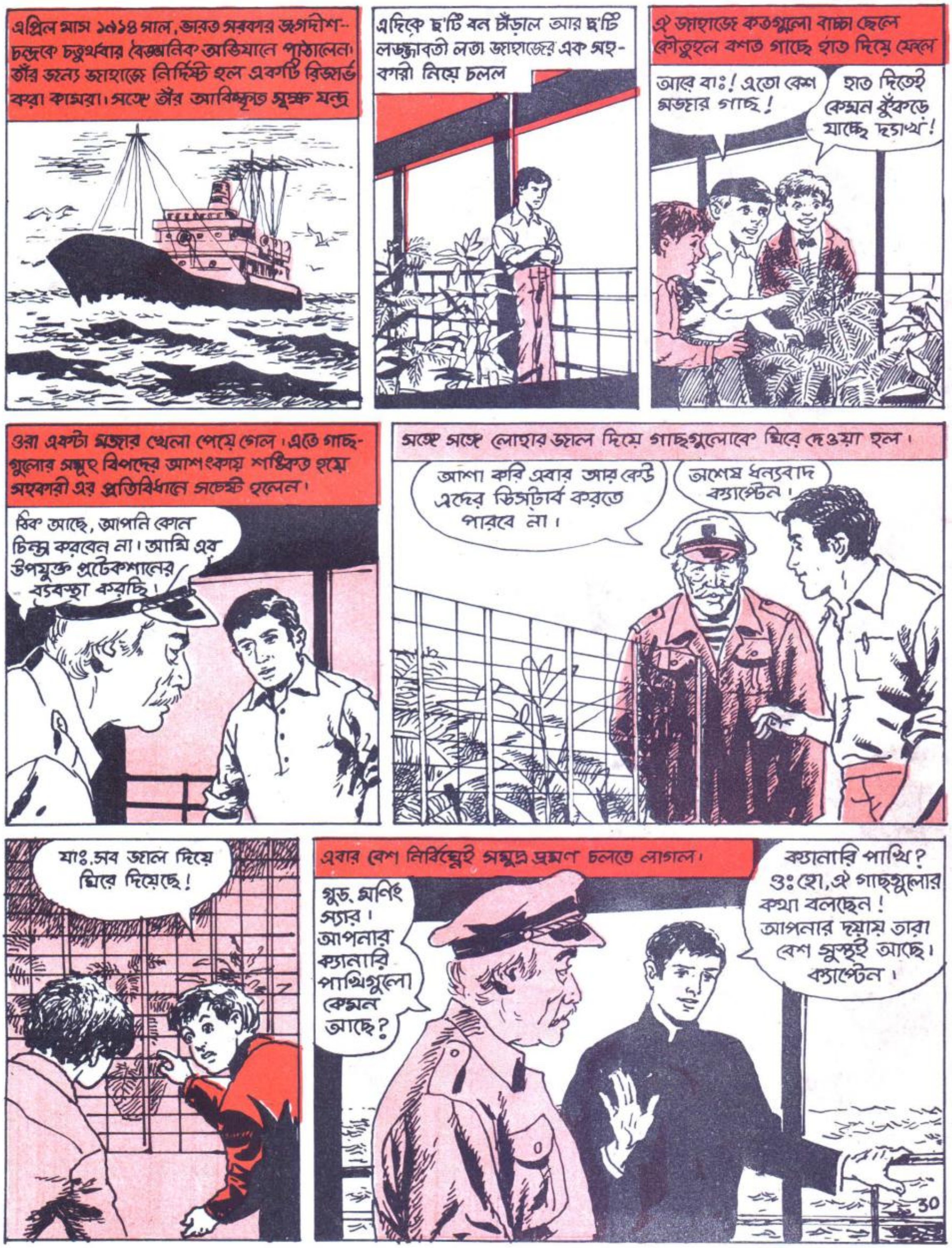
এপ্রিল মাস ১৯১৪ সাল, ভারত সরকার জগদীশ-চন্দ্রকে চতুর্থবার বৈজ্ঞানিক অভিযানে পাঠালেন। তাঁর জন্য জাহাজে নির্দিষ্ট হল একটি রিজার্ভ করা কামরা। সঙ্গে তাঁর আবিষ্কৃত সূক্ষ্ম যন্ত্র
এদিকে ছ'টি বন চাঁড়াল আর ছ'টি লজ্জাবতী লতা জাহাজের এক সহকারী নিয়ে চলল
ঐ জাহাজে কতগুলো বাচ্চা ছেলে কৌতুহল বশত গাছে হাত দিয়ে ফেলে
আরে বাঃ! এতো বেশ মজার গাছ!
হাত দিতেই কেমন কুঁকড়ে যাচ্ছে দ্যাখ!
ওরা একটা মজার খেলা পেয়ে গেল। এতে গাছগুলোর সমূহ বিপদের আশংকায় শঙ্কিত হয়ে সহকারী এর প্রতিবিধানে সচেষ্ট হলেন।
ঠিক আছে, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি এর উপযুক্ত প্রটেকশানের ব্যবস্থা করছি।
সঙ্গে সঙ্গে লোহার জাল দিয়ে গাছগুলোকে ঘিরে দেওয়া হল।
আশা করি এবার আর কেউ এদের ডিসটার্ব করতে পারবে না।
অশেষ ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন।
যাঃ, সব জাল দিয়ে ঘিরে দিয়েছে!
এবার বেশ নির্বিঘ্নেই সমুদ্র ভ্রমণ চলতে লাগল।
গুড মর্ণিং স্যার। আপনার ক্যানারি পাখিগুলো কেমন আছে?
ক্যানারি পাখি? ওঃ হো, ঐ গাছগুলোর কথা বলছেন! আপনার দয়ায় তারা বেশ সুস্থই আছে। ক্যাপ্টেন।
30

বিজ্ঞান ভিত্তিক ধারাবাহিক উপন্যাস

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সবুজ বনের গান

॥ বারো ॥

আবার শয়তানের কবলে

সেদিন দুপুর অব্দি প্রিয়বর্ধন স্বপ্ন স্বপ্ন করেই কাটাল। তার পাগলামি দেখে হাসি পাচ্ছিল। সে এই উৎকট স্বপ্ন ভাঙিয়ে দেবার জন্য আমাকে তার গায়ে চিমটি কাটতে বলেছিল। নিজেও চেষ্টা করছিল স্বপ্নটা যাতে ভাঙে। নিজের মাথায় চাঁটি মেরে, কখনও ডিগবাজী খেয়ে, কখনও বা গাছের গুঁড়িতে ঢু মেরে সে একসময় বাচ্চা ছেলের মতো ভ্যাঁ করে কেঁদেও ফেলল।

তখন আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। হাসতে হাসতে বললুম, "প্রিয়বর্ধন, তুমি কি এখনও টের পাচ্ছ না যে ব্যাপারটা স্বপ্ন নয় বাস্তব।

প্রিয়বর্ধন চোখ মুছে নাক ঝেড়ে বলল, "অসম্ভব। জয়ন্ত, আমরা হয়তো আসলে কোনো ডাইনির দ্বীপে এসে পড়েছি। এ সবই তার যাদুর খেলা। এরপর মন্ত্রবলে ডাইনিটা হয়তো আমাদের ওইরকম গাছপালা করে ফেলবে। আমাদের আর মানুষ হয়ে দেশে ফেরা হবে না।"

"আচ্ছা প্রিয়বর্ধন, তুমি কান করে শোনো তো! বেহালার মতো সুর শুনতে পাচ্ছ না?

প্রিয়বধন শুনতে শুনতে বলল, "তা তো পাচ্ছি। ওই তো ডাইনির যাদু।

"সকালে বনের ভেতর অর্কেস্ট্রার সুর শুনে তুমি গির্জা খুঁজতে গিয়েছিলে!" গম্ভীরভাবে বললুম—বোকা কোথাকার! এখনও কি তুমি বুঝতে পারছো না এটা কোন্‌দ্বীপ?"

প্রিয়বর্ধন আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর নড়ে বসল। তার মুখটা কেমন যেন জ্বলে উঠল কী আভায়। দম আটকানো গলায় সে বলে উঠল, "জয়ন্ত, জয়ন্ত! তবে কি এই সেই কোহাও রঙ্গোরঙ্গো? আমরা কি তাহলে সত্যি কিওটা দ্বীপে বসে আছি?

"হ্যাঁ, প্রিয়বর্ধন।"

প্রিয়বর্ধনের পাগলামি ঘুচে গেল সঙ্গে সঙ্গে। উত্তেজনা দমন করে সে আমার হাত ধরে টানল। চাপা গলায় বলল, "তাহলে আর দেরী না করে এস, আমরা রোজারিওর গুপ্তধন খুঁজে বের করি। চুপচাপ বসে থাকার মানে হয় না, জয়ন্ত। তাছাড়া যা শুনেছি, এই ভূতুড়ে দ্বীপে বেশিদিন মানুষ বাঁচতে পারে না। সবুজ রোগে মারা যায়।"

"সবুজরোগ কী?"

"সে এক সাংঘাতিক অসুখ। সারা শরীর সবুজ হয়ে যায়।"

অমনি আমার মনে পড়ে গেল, রুবিদ্বীপের জেলেদের গায়ে সবুজ অ্যালার্জি হওয়ার কথা শুনেছিলুম। এবার বুক কেঁপে উঠল। প্রিয়বর্ধন আমাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল। বললুম, "কোথায় যাচ্ছ এমন করে?"

প্রিয়বর্ধন তেমনি চাপা স্বরে বলল, "এবেলা থেকেই কাজ শুরু করা যাক। প্রথমে সারা দ্বীপের চৌহদ্দি দেখে নিই এস। চারদিক ঘুরে একটা ম্যাপ তৈরী করা দরকার। তারপর……"

বাধা দিয়ে বললুম, "ম্যাপ আঁকবে কিসে? কাগজ কলম তো নেই।"

"মাটির ওপর বা বালিতে আঁকব। সে তুমি ভেবোনা।" প্রিয়বর্ধন উৎসাহের সঙ্গে বলল। "তারপর শুরু হবে তন্নতন্ন খোঁজা। এক ইঞ্চি জায়গা বাদ রাখব না।"

আমার অবাক লাগছিল ভেবে, পৃথিবীতে কতরকম মানুষ আছে তাহলে! এই এক আশ্চর্য জনমানুষহীন দ্বীপ, যেখানে গাছপালা গান গায়, যেখানে গাছপালা প্রাণীদের মতো সজাগ, মানুষের মতোই তারা দয়ালু এবং ফল তুলে দেয় ক্ষুধার্তের ঠোঁটে—এমন বিচিত্র এক ভূখণ্ডের বিস্ময়কর ঘটনাবলীর দিকে প্রিয়বর্ধনের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। সে লুকানো সোনাদানার প্রচণ্ড লোভে অস্থির হয়ে উঠেছে। বিড়বিড় করছে, 'রোজারিওর গুপ্তধন! রোজারিওর গুপ্তধন!'

ঝাঁকে ঝাঁকে বুমেরাং গড়নের কাঠপোকা বা কেঠো পোকা সবুজ ঘাসের মাঠে বসে ছিল। আমরা তাদের মধ্যে গিয়ে পড়তেই তারা লাফাতে লাফাতে কে কোথায় লুকিয়ে পড়ল। প্রিয়বর্ধনের চোখ সেদিকে নেই। মুখেচোখে ধূর্ততা ঠিকরে পড়ছে। মাঝে মাঝে বলছে, 'আমরা রাজা হয়ে যাব, জয়ন্ত! রোজারিওর ধনরত্ন পেলে আর পরোয়া নেই।'

রোজারিও কে, সেকথা কয়েকবার জিগ্যেস করেও জবাব পেলুম না। তখন ভাবলুম, নিশ্চয় কোনো প্রাচীন জলদস্যু হবে। রাজাকো, ক্যারিবো, কিয়াং—সবাই তাহলে এই জলদস্যুর পুঁতে রাখা গুপ্তধনের জন্য হন্যে হয়ে পরস্পর লড়াই করেছে। রাজাকোর প্রাণ গেছে। ক্যারিবো আর কিয়াং এখনও জীবিত। এখন কোথায় তারা কে জানে? ক্যারিবোর সঙ্গে ডাইনির দ্বীপে আমাদের দেখা হয়েছে। তার মোটর বোট চুরি করে আমরা পালিয়ে এসেছি। ক্যারিবোর দশা কী হয়েছে, তাও বলা কঠিন।

তারপর মনে পড়ল কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের কথা। ডঃ বিকর্ণ, কাপ্তেন ব্যুগানভিলি, আর রোমিলার কথা। মন অমনি খারাপ হয়ে গেল। নৌবাহিনীর সাহায্যে তাঁরা কি বুবি দ্বীপের চারপাশের সমুদ্রে আমার মৃতদেহ খুঁজে বেড়াচ্ছেন এখনও? আচ্ছা, কাপ্তেন ব্যুগানভিলি তো এ দ্বীপে এসে পড়েছিলেন। তাঁর কি পথের কথা মনে নেই একটুও?

কিওটো যে ছোট্ট দ্বীপ, সেটা ক্রমশ বুঝতে পারছিলুম। উত্তর থেকে সোজা দক্ষিণে দু মাইল গিয়েই আবার সমুদ্র দেখা গেল। তারপর পশ্চিমে এগিয়ে গেলুম আমরা। পশ্চিম এলাকাটা ছোট বড় পাহাড়ে দুর্গম হয়ে আছে। একেবারে ন্যাড়া পাথুরে পাহাড়। কিন্তু কী বিচিত্র রঙ তাদের। কোনোটা কালো, কোনোটা লাল, হলুদ, নীল। একটা সবুজ রঙের পাহাড়ও দেখতে পেলুম। ওদিকে গাছপালা নেই বললেই চলে। একটা লাল টিলার ওপর পৌঁছে দ্বীপটা পুরো চোখে পড়ল।

দ্বীপটার গড়ন তিনকোণা। মধ্যিখানে বিরাট সবুজ ফাঁকা মাঠ। মাঠ জুড়ে টুকরো পাথর পড়ে আছে। উত্তর ও দক্ষিণে ঘন বন। পুবে কিছুটা ফাঁকা। কিন্তু তিনকোণা দ্বীপটাকে ঘিরে রেখেছে প্রায় গোলাকার প্রবাল পাঁচিল। এটাকে বলয় দ্বীপ বলা যায়। প্রবাল পাঁচিলটা শুধু পুবের দিকে এক জায়গায় ভাঙা এবং সেটাই এই দ্বীপে ঢোকার গেট যেন। ওই গেট দিয়ে আমরা আসতে পেরেছি। বাকি সমস্ত বলয় উঁচু হয়ে ঘিরে রেখেছে পাঁচিলের মতো। তার গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে মহাসাগরের প্রচণ্ড সব ঢেউ। আছড়ে পড়ে ধুয়ে দিচ্ছে পাঁচিলকে। এতক্ষণে সামুদ্রিক পাখির ওড়াউড়ি চোখে পড়ল প্রবাল বলয়ের কাছে।

প্রিয়বর্ধন বলল, "হুঁ— তাহলে মোটামুটি একটা ম্যাপ পাওয়া গেল। এবার জয়ন্ত, আমরা কিছু সূত্র খুঁজব।"

'এখান থেকেই শুরু করি, এস।' বলেই সে টিলা থেকে নামতে শুরু করল।

"কিসের সূত্র ?"

প্রিয়বর্ধন হাসল। "রোজারিও যখন এ দ্বীপে ধনরত্ন পুঁততে এসেছিল, তখন নিশ্চয় কিছু চিহ্ন রেখেছিল। ধরো, জাহাজের একটুকরো কাঠ, কিংবা পেরেকে। অথবা একটা হাতুড়ি।……যাই হোক, খুঁজলে নিশ্চয় পেয়ে যাব কিছু। এস। এখান থেকেই খুঁজতে শুরু করি।"

"প্রিয়বর্ধন, এ দ্বীপে যেই এসেছে, তাকে আসতে পুবের ওই ভাঙা জায়গাটা দিয়ে। কাজেই…"

আমার কথা কেড়ে প্রিয়বর্ধন বলল, "ওহে বোকারাম ! যেখান দিয়েই আসুক, গুপ্তধন লুকোনোর জন্য দুর্গম জায়গা সে বেছে নেবে কি না ?"

"তা ঠিক।"

"দুর্গম জায়গা বলতে দেখছি, এই পাহাড়ী এলাকা আর ওই ঘন জঙ্গল। এখান থেকেই শুরু করি। এস। বলে প্রবল উৎসাহে সে টিলা থেকে নামতে থাকল।

তাকে অনুসরণ করলুম। দুপুর গড়িয়ে গেছে। এত ঘোরাঘুরি করছি, অথচ একটুও ক্লান্তি লাগছেনা। নিশ্চয় সেই ফলের গুণ। টিলার নিচে পৌঁছে একটা পাহাড়ী খাদের দিকে পা বাড়াল প্রিয়বর্ধন। ডান দিকে এক ছিপছিপে চেহারার গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই গাছটা হঠাৎ পিয়ানোর বাজনা বাজাতে শুরু করল। কী মনমাতানো সেই সুর ! আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম। "প্রিয়বর্ধন ! শোনো, শোনো, !" বলে ডাকলুম। কিন্তু সে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, "কী শুনব ? আমার এক খুড়ো ওর চেয়ে ভাল পিয়ানো বাজাতে পারে ! দেখছ না ? বাতাস বইছে বলেই গাছটা এমন বিচ্ছিরি ভুতুড়ে শব্দ করছে। চলে এস।"

বেরসিক প্রিয়বর্ধনের টানে এগিয়ে যেতে হল। খাদটা ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে। খাদের দুধারে রঙীন পাহাড় দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক পা এগিয়ে প্রিয়বর্ধন হঠাৎ বসে পড়ল। তারপর উত্তেজিত ভাবে বলল, "পাওয়া গেছে ! পাওয়া গেছে !"

গিয়ে দেখি, একটা মরচে ধরা লোহার রড মাটির ভেতর কাত হয়ে ঢুকে রয়েছে। সেটা টানাটানি করতেই খানিকটা চাবড়া উঠে গেল মাটির। তারপর যা দেখলুম, ভয়ে বিস্ময়ে শিউরে উঠলুম। ওটা রড নয় আসলে একটা তলোয়ারের বাঁট। আর চাবড়ার তলায় একটা মানুষের কংকাল দেখছে। তলোয়ারটা কংকালের ভেতর বিঁধে রয়েছে। রুদ্ধশ্বাসে বললুম, "প্রিয়বর্ধন ! কেউ এই মানুষটাকে তলোয়ার বিঁধিয়ে খুন করেছিল। সেই অবস্থায় পড়ে ছিল মৃতদেহটা। বছরের পর বছর বৃষ্টিতে মাটি ধুয়ে ঢালু খাদে এসে জমেছে আর ওকে ঢেকে ফেলেছে।"

প্রিয়বর্ধন "বলল, এ তাহলে নিশ্চয় রোজারিওর দলের লোক। এস, এগিয়ে গেলে আমরা আরও সূত্র পাব।"

আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম। খাদে বিকেলের গাঢ় ছায়া জমে আছে। আর এখানে ওখানে পড়ে আছে আরও কয়েকটা নরকংকাল। কোনোটা মুণ্ডহীন। মুণ্ডুটা পড়ে আছে আলাদা হয়ে। কালো ছায়ায় কংকাল আর খুলিগুলো ধপধপে সাদা দেখাচ্ছে। দেখলে আতঙ্কে শরীর হিম হয়ে যায়।

তারপর হঠাৎ আগে শোনা সেই চিৎকার বা গর্জন শুনতে পেলুম। "স্টপ ইট। স্টপ ইট। আই সে স্টপ্ ইট !" দুধারের পাহাড়ে গমগম করে প্রতিধ্বনি উঠল। কানে তালা ধরে যাচ্ছিল। সেই সময় দেখলুম প্রিয়বর্ধন আতঙ্কে পাগলের মতো যে পথে এসেছি, সেই পথে দৌড়ুতে শুরু করেছে। আমি তাকে অনুসরণ করলুম।

শব্দগুলো যেন সারা দ্বীপ জুড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে। তারপর শোনা গেল, "আই মাস্ট কিল ইউ !"…"কিল ইউ…কিল…কিল !" তারপর আর্তনাদ। "হেল্প ! হেল্প ! হেল্প !" সেই সঙ্গে অন্তিম আর্তনাদের পর আর্তনাদ !

প্রিয়বর্ধন জঙ্গলের ভেতর উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়ুচ্ছিল। তাকে ধরে ফেললুম। বললুম, "ও কিছু নয়, প্রিয়বর্ধন ! অতীতের প্রতিধ্বনি মাত্র। অত ভয় পাবার কিছু নেই।"

প্রিয়বর্ধন ধুপ করে ঘাসে বসে পড়ল। তারপর ভয়ার্ত মুখে বলল, "রোজারিওর ভূত, জয়ন্ত ! শুধু একা নয় ওর দলের সবাই ভূত হয়ে গেছে। আমাদের বরাত বড় মন্দ। তুমি বুঝতে পারছনা ? ওরা ভূত হয়ে গুপ্তধন পাহারা দিচ্ছে।"

ওকে টেনে ওঠালুম। "কাল সকাল থেকে খোঁজা যাবে। চলো, আমরা পুব দিকের বিচে যাই। বেলা পড়ে আসছে। অচেনা জায়গার চেয়ে চেনা জায়গায় রাত কাটানোই ভাল।"

দুজনে বাঁ দিকে ঘুরে ফাঁকা মাঠের দিকে এগিয়ে গেলুম। বনের ভেতর কোথাও ক্ষীণ সুরে বাঁশি বাজছিল। ক্রমশ সেই সুর চাপা দিয়ে গম্ভীর অর্কেস্ট্রা শুরু হল। প্রিয়বর্ধন ভয় পেয়ে লম্বা পায়ে হাঁটতে থাকল।

কিন্তু ফাঁকা মাঠের ধারে পৌঁছুতেই এক বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ল।

ক্যাকটাস জাতীয় একটা অদ্ভুত গড়নের প্রাণী কিংবা নিছক গাছ আস্তেসুস্থে হেঁটে যাচ্ছে। প্রিয়বর্ধন বলে উঠল "ও কী জয়ন্ত ! ওটা গাছ, না কোনো জন্তু ?"

অবাক হয়ে বললুম, "আশ্চর্য ! ওটা যে দেখছি

একটা ক্যাকটাস। চলো, তো দেখি।”

প্রিয়বর্ধন আমার পিছনে কুণ্ঠিতভাবে এগুলো। সেই বিচিত্র চলমান ক্যাকটাসের হাত দশেক দূরে পৌঁছুলে সেটা থেমে গেল। তারপর আরও অবাক হয়ে দেখলুম, ওটার নিচের দিক থেকে এক রাশ শেকড় কেঁচোর মতো নেমে মাটিতে ঢুকে গেল।

সাহস করে কাছে গেলুম। সত্যি ক্যাকটাসই বটে। এমন বিদঘুটে চলমান ক্যাকটাস দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কিছুক্ষণ।

প্রিয়বর্ধনের তাড়ায় এগিয়ে যেতে হল। কিছু দূরে গিয়ে একবার পিছু ফিরে দেখলুম, অদ্ভুত ক্যাকটাস জীবটি আবার চলতে শুরু করেছে। বললুম, “প্রিয়বর্ধন! তাহলে দেখা যাচ্ছে চলমান উদ্ভিদও পৃথিবীতে আছে। কে জানে এই সৃষ্টি ছাড়া দ্বীপে আরও কত বিচিত্র উদ্ভিদ দেখতে পাব।”

প্রিয়বর্ধন সে কথায় কান না করে একটু হেসে বলল, “আমার কিন্তু ক্ষিদে পেয়েছে!”

মাঠের ভেলভেটের মতো নরম সবুজ ঘাসের ওপর সেই পিচ জাতীয় ফলের গাছ আরও অনেক আছে। একটা গাছের দিকে পা বাড়িয়েছি, সেই সময় প্রিয়বর্ধন বলে উঠল, “জয়ন্ত! জয়ন্ত! ওটা কী দেখ তো?”

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি, শেষ বিকেলের সমুদ্রে প্রবাল পাঁচিলের সেই ভাঙা অংশটার কাছে শাদা কী একটা ঢেউয়ে ভেসে উঠছে আবার যেন তলিয়ে যাচ্ছে। ভাল করে দেখে বুঝলুম ওটা একটা মোটর বোটই বটে!

আনন্দে চিৎকার করে দৌড়ুতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ বাঁ পাশে পড়ে থাকা কয়েকটা পাথরের আড়াল থেকে তিনটে মূর্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “হ্যাণ্ডস্ আপ!”

মূর্তিত্রয় এ দ্বীপের কোনো আজব গাছ-মানুষ, না আমাদের মতো মানুষ লক্ষ্য করতে গিয়ে চোখে পড়ল, তাদের হাতে রিভলবার আর বন্দুকও আছে। সঙ্গে সঙ্গে দুহাত তুলে দাঁড়িয়ে গেলুম।

তারপর প্রিয়বর্ধন দু হাত তুলে ফিসফিস করে উঠল, “শয়তান ক্যারিবো!”

এবার চিনতে পারলুম ক্যারিবোকে। সে এগিয়ে এসেই প্রিয়বর্ধনের চোয়ালে রিভলবারের বাঁট দিয়ে মারল। প্রিয়বর্ধন পড়ে গেল। তারপর ক্যারিবো আমার দিকে ঘুরে কুৎসিত হেসে বলল, “এই যে কলকাতাওয়ালা বাঙালীবাবু। মোটর বোট চুরির শাস্তি কত ভয়ঙ্কর, একটু-একটু করে টের পাবে এবার। ফুতাং! একে বিচে নিয়ে চল্! আর উংচু, তুই ওই দোআঁশলা বদমাসটাকে তুলে নিয়ে আয়।”

গরিলার মতো চেহারা—সম্ভবত মালয়ের লোক, সেই ফুতাং এসে আমার ঘাড় ধরল। ওর অন্য হাতে বন্দুক। কিছু করার নেই। উংচু নামে বেঁটে হিংস্র চেহারার লোকটার গায়ে যেন দৈত্যের বল। সে প্রিয়বর্ধনকে পুতুলের মতো কাঁধে তুলে নিয়ে চলল পুবের বিচের দিকে। প্রিয়বর্ধন অজ্ঞান হয়ে গেছে। কষায় রক্ত গড়াচ্ছে।

বিচের বালিতে আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল ফুতাং। ক্যারিবো বিকট হেসে বলল, “তারপর বাঙালীবাবু! প্রথমে বলো তো গুপ্তধনের হদিস কতটা পেলে? তারপর অন্য কথা।”

[ক্রমশঃ]

•মজার ছবি•

•প্রনব হোড়•

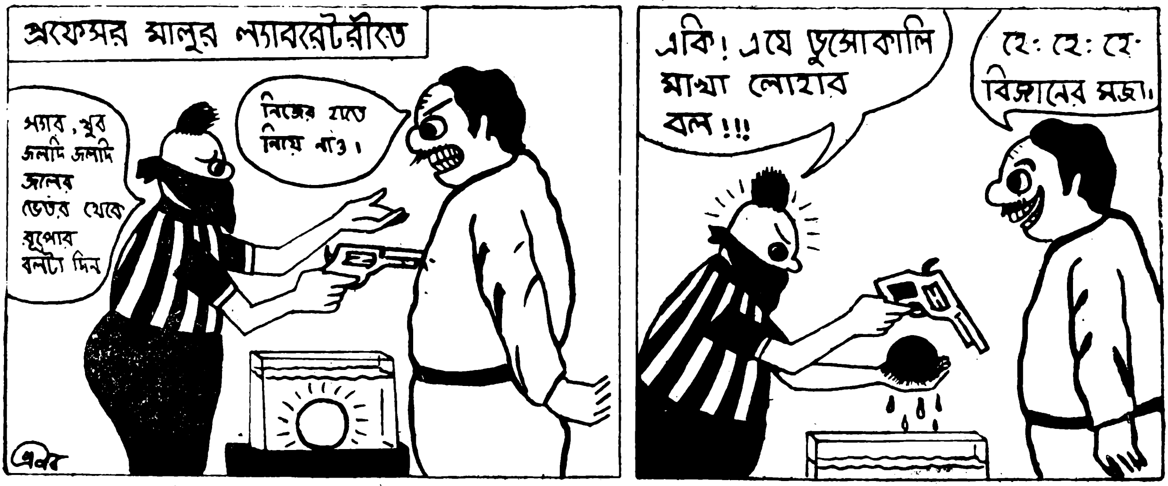
প্রফেসর মালুর ল্যাবরেটরীতে
স্যার, খুব জলদি জলদি জলের ভেতর থেকে রুপোর বলটা দিন
নিজের হাতে নিয়ে নাও।
একি! এযে ভুসোকালি মাখা লোহার বল!!!
হে: হে: হে: বিজ্ঞানের মজা।
প্রনব

নারিকেল গাছ

রবীন্দ্রনাথ সর

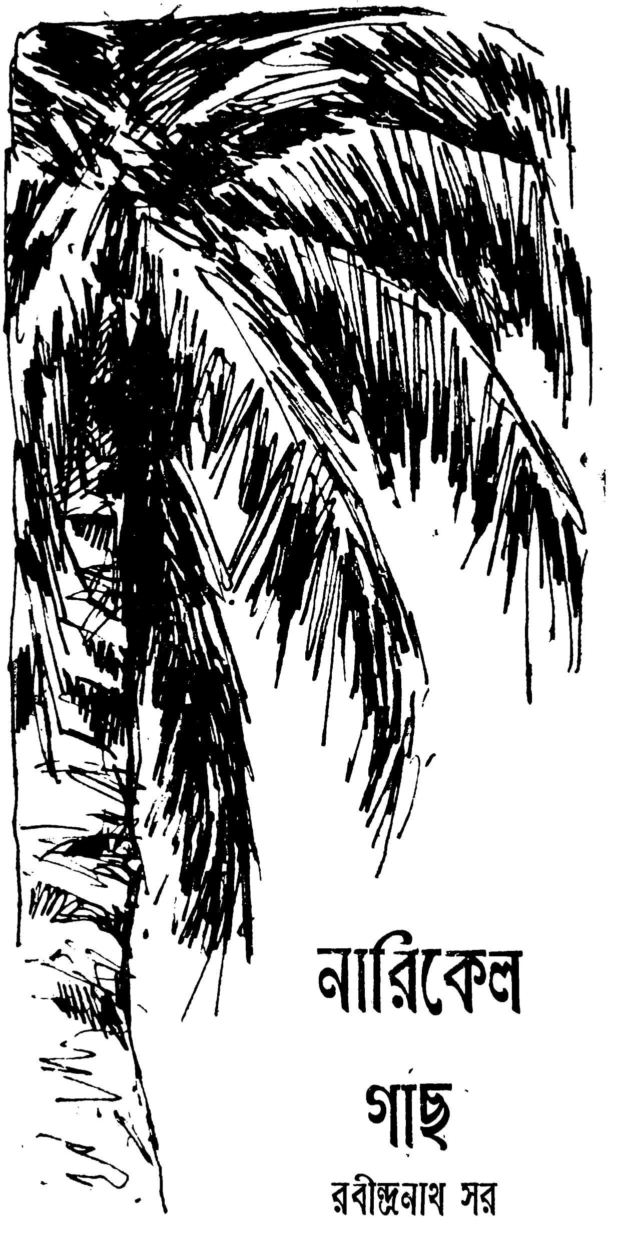

গাছটি আমাদের সকলের খুব পরিচিত তবুও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে একটু দেখে নেওয়া যাক্। গাছগুলি লম্বায় প্রায় 25—30 মিটার। কোন শাখাপ্রশাখা থাকে না। পাতাগুলি বেশ বড়, 4—5 মিটার লম্বা। গাছের গুঁড়ির ব্যাস 40 –45 সেণ্টিমিটার। লম্বা, যার দু পাশে 180—250টি পর্যন্ত পত্রক সাজান থাকে। একটি নারিকেল গাছ বৎসরে 50—100টির বেশি ফল দেয়।

নারিকেল গাছ ভারতের বেশিরভাগ জায়গায় নারিকেল, নারিয়েল, গোতোমা, কোবারী প্রভৃতি নামে পরিচিত। সিংহলে—পোলগাহা এবং বার্মায়—অঙ্গবিন নামেই অধিক সমাদৃত। এর বৈজ্ঞানিক নাম—কোকোজ ন্যুসিফেরা (Cocos nucifera Linn), ইহা Palmae বা Palmaceae পরিবার অন্তর্ভূক্ত Palmales বর্গের একবীজ পত্রী উদ্ভিদ।

ব্যবহারিক দিক থেকে এই গাছটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক। এর ফুল, কচি ফল, নারিকেল শাঁস, খোসা যা ছোবড়া নামে পরিচিত, মালা (বীজের শক্ত খোলা), গাছের কাণ্ড, মূল, পাতার শিরা (পিছ) এমনকি তার পাতাও বেশ চড়া দামে বিক্রি হয়। কচি ডাবের জল গ্রীষ্মে পরম তৃপ্তি দায়ক পানীয় হিসাবে বা আপ্যায়নে ব্যবহৃত হলেও ক্রিমি নাশক হিসাবে বা মুত্র কৃচ্ছ্রতায় বৈদ্যগণ এর ব্যবহার করে থাকেন। ঝুনো নারকেল প্রচুর খাদ্যগুণ সম্পন্ন পুষ্টিকর খাদ্য। নারিকেলে থাকে চর্বি জাতীয় পদার্থ যেমন, ক্যাপরোইক অ্যাসিড, ক্যাপরিলিক অ্যাসিড, লাউরিক ও মাইরিসটিক, প্যামিটিক, স্টিয়ারিক, আলিক, লাইনোলিক অ্যাসিড ইত্যাদি এছাড়া। এতে ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স এবং হিসটিডিন, আরজিনিন, লাইসিন, টাইরোসিন, প্রোলাইন, লিউসিন, অ্যলানিন, ট্রিপটাফেন জাতীয় প্রোটীন প্রভৃতি পাওয়া যায়। এমন খাদ্য উপাদানের সমাহার অন্য কোনো ফলে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন তরকারী ও মিষ্টান্ন প্রস্তুতে নারিকেলের ব্যবহার তো হয়ই, তেল উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এর স্থান অদ্বিতীয়। নারকেল তেল সাবান প্রস্তুত করতে ভোজ্য তৈল হিসাবে এবং বিভিন্ন প্রকার কেশ তেল প্রস্তুত ছাড়া ঔষধ, যন্ত্রাংশ ঠিক রাখতেও ব্যবহার করা হয়। কবিরাজগণ দুধের পরিবর্তে নারকেলের শাঁস নিঃসৃত দুগ্ধ পানের উপদেশ দেওয়া ছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্যে, সর্দি-কাশিতে, অম্ল, অজীর্ণে, ফিতাক্রিমি দমনে, শুক্রতারল্যে, অনিয়মিত ঋতুস্রাবে ও হেমিক্রেনিয়া প্রভৃতি রোগে নারকেল খাওয়ার বিধান দিয়ে থাকেন। গাছের ছোবড়া থেকে খুব শক্ত দড়ি, মাদুর, গদি, বাসের সিট, ঘরের খসখস, পাপোশ, থলে, খাটিয়ার ছাউনি, বুরুশ প্রভৃতি এবং খোলা থেকে খেলনা তৈরি করে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করা যায়। এর কাঠ তাল কাঠের মতো বেশ শক্ত ও মজবুত। এ দিয়ে ঘরের কাঠামো বানানো যায়। নারকেল মালা থেকে বোতাম ও নানান আসবাব তৈরি হয় আর একে পুড়িয়ে দাদের ঔষধ তৈরিও হয়। পাতার শিরা থেকে পাওয়া পিছ দিয়ে তৈরি ঝাঁটা এবং মুড়ি ভাজার কাঠিও তৈরি হয়। নারকেল গাছের পাতা জ্বালানী ছাড়াও ঘরের ছাউনি দিতে, ফলের টুকরী, মাদুর, ব্যাগ, টুপী, ঘরের পার্টিশানের বেড়া দিতে, ঘরের চার ধারে বেড়া দেওয়ায় এবং দলমা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। ইন্দোনেশিয়া, পশ্চিম সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে পাতার জন্য এর ব্যাপক চাষ হয়। এই উদ্ভিদ সম্পর্কে ভারতে কিছু কিছু গবেষণা হলেও অধিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বেলদা গঙ্গাধর একাডেমী, বেলদা, মেদিনীপুর

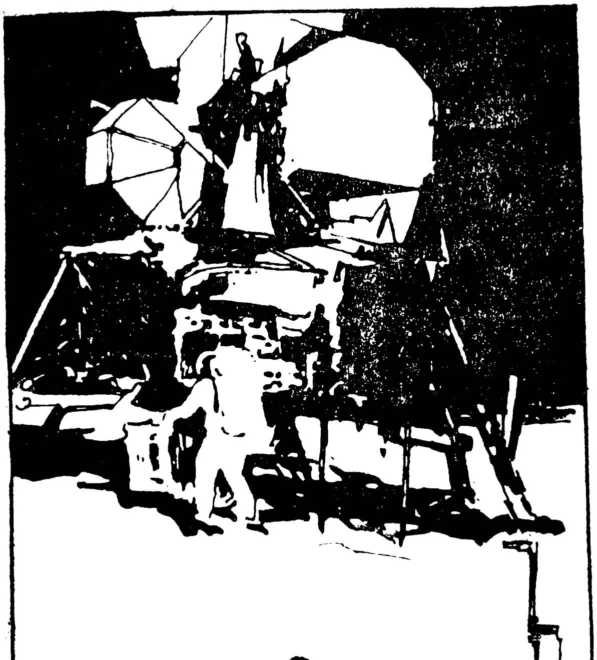

চন্দ্র অভিযানের গোড়ার কথা

বাচ্চু মুখার্জী

চন্দ্রে যাবার ইচ্ছা জেগেছিল মানুষের মনে বহুকাল আগে থেকেই। গ্রহান্তরে ভ্রমণের তৃষ্ণা মানুষকে স্বপ্নবিলাসী করে তোলে। গ্রহান্তর যাত্রার কাল্পনিক কাহিনীতে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের লোক উৎসাহিত হয়—তাই কাল্পনিক 'সায়েন্স ফিক্‌সান'এর বইও লেখা হয় বহু।

অবশেষে 1957 সালের 4ঠা অক্টোবর রাশিয়া সর্বপ্রথম এই প্রচেষ্টায় অগ্রসর হয়। রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা প্রায় আড়াই মন ওজনের একটা বিশেষভাবে নির্মিত রকেট উর্ধ্বাকাশে নিক্ষিপ্ত করেন। সেটা পৃথিবীর থেকে 500 মাইল উর্দ্ধে উঠে ঘণ্টায় 18 মাইল বেগে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। রাশিয়ান ভাষায় এটার নাম স্পুটনিক বা শিশু চন্দ্র। এটা একটা কৃত্রিম উপগ্রহ বিশেষ। তারপর আমেরিকান বিজ্ঞানীরা ক্রমান্বয়ে এরকম রকেট ছাড়তে থাকেন। এইসব রকেটের মধ্যে যে সব স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ছিল তাদের সাহায্যে মহাকাশের নানা তথ্য বিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয় করতে থাকেন। তারপর রাশিয়া লুনিক 3 নামে একটা নকল উপগ্রহ চন্দ্রমণ্ডলে পাঠান। এই উপগ্রহের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা চাঁদের সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন।

মহাকাশে জীবদেহের উপর কিরকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে সেটা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে রাশিয়া চন্দ্রযানে একটা কুকুর পাঠান—নাম তার লাইকা। আমেরিকা পাঠান চন্দ্রযানে দুটো বানর। এবং পরে আরো কয়েকটা জন্তু পাঠান - সবই পরিকল্পনানুযায়ী যন্ত্রসহ নির্দিষ্ট স্থানে এবং সময়ে ফিরে আসে, এইসব পরীক্ষা দ্বারা লব্ধজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সারা জগতকে স্তম্ভিত করে রাশিয়া পাঠায় 1961 সালে 'ভোস্তক-1' যানে করে ক্যাপ্টেন ইউরি গাগারিনকে - মোট 108 মিনিট শূন্যে ভ্রমণ করে যানসহ ফিরে আসেন গাগারিন।

1965 সালে রাশিয়া আবার একটা আশ্চর্য কাণ্ড করে বসে, 'ভোস্তক-2' যানে করে পাঠায় কর্ণেল লিওনভ্‌-কে। ইনি যান থেকে বেরিয়ে চাঁদের নিকটবর্তী শূন্যে 10 মিনিট কাল সাঁতার কেটে আবার যথাসময়ে যানে প্রবেশ করে পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

ইতিমধ্যে আমেরিকার বৈজ্ঞানিকদের গবেষণাও চলতে থাকে। উভয় দেশ—আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে চাঁদে পৌঁছুবার। আমেরিকার বিস্ময়কর পরীক্ষা হল মহাকাশে দুটি মহাকাশযানের জোট-বাঁধানো, 4ঠা ডিসেম্বর 1965 জেমিনি - 6 উর্ধ্বাকাশে নিক্ষিপ্ত হয়। তারপর 14-ই ডিসেম্বর নিক্ষিপ্ত হয় জেমিনি—7, পরবর্তী মহাকাশযানের সঙ্গে পূর্ববর্তী মহাকাশযান শূন্যে মিলিত হয় $5\frac{1}{2}$ জুন 1966, জেমিনি-9 নামক যানে করে আমেরিকা পাঠায় স্ট্যাফোর্ড ও ইউজীন কার্ণালকে, এদের মধ্যে কার্ণাল যান থেকে বেরিয়ে মহাকাশে 2 ঘণ্টা 5 মিনিট শূন্যে পরিভ্রমণ করে আবার ফিরে এলেন যানে করেই সুস্থ শরীরে।

চন্দ্রাভিযানে দুটো রাষ্ট্র—আমেরিকা ও রাশিয়া পৃথক বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করে। আমেরিকা চেয়েছে তার শূন্যচারীদের চন্দ্রপৃষ্ঠে নামাতে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আর রাশিয়া চেয়েছিল তার পৃথিবী পরিভ্রমণকারী উপগ্রহ থেকে শূন্যচারীদের চাঁদে অবতরণ করাতে। রাশিয়ার চেষ্টা ছিল শূন্যে একটি স্থায়ী স্টেশনের জন্যে, যে স্টেশন থেকে যান চালানোর উপাদান সংগ্রহ করে অভিযাত্রীরা চন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করতে পারবে।

1969 সালের মে মাসে দুজন আমেরিকান নভশ্চর তাঁদের আদিযান থেকে চন্দ্রযানে গেলেন এবং মাত্র দশ মাইল দূর থেকে চন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল চন্দ্রে অবতরণের একটি উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান। অবশেষে আমেরিকার প্রচেষ্টা সার্থক হয়। অ্যাপোলো—11 যানে চড়ে নীল আর্মষ্ট্রং, মাইকেল কলিন্স এবং এডুইন অল্‌ড্রিন পাড়ি দেন মহাশূন্য দিয়ে এবং 20-শে জুলাই, 1969 তাঁরা

চাঁদের কাছে পৌঁছান, পূর্ব-পরিকল্পনানুযায়ী অ্যাপোলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় চাঁদের ভেলা ঈগল। অ্যাপোলো-11 যন্ত্রযানের মধ্যে অপেক্ষা করতে থাকেন কলিন্স আর ঈগল-ভেলায় চড়লেন আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন। ঈগল এসে অবতরণ করে চন্দ্রপৃষ্ঠে 20শে জুলাই 1969-এর শেষ রাতে, 21শে জুলাই ভোরে বিশ্রামের পর ওরা দুজন অদ্ভুত পোষাকপরা অবস্থায় নামেন চাঁদের পৃষ্ঠে—লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলেন। চাঁদ হয় পরাজিত। চাঁদে মানুষ নেই, জীবজন্তু নেই, গাছপালা নেই, আছে কেবল পাহাড় পর্বত, রাশি-রাশি ধুলো আর পাথর। জল নেই কোথাও। তাঁরা ভ্রমণ করেন, দুচোখ ভরে অপূর্ব মরুভূমিতে দৃশ্য দেখেন, বহু ছবি ওঠে যন্ত্রের সাহায্যে। তারপর পাথর কুড়িয়ে, মুঠো মুঠো ধুলো বা চাঁদের মাটির নিদর্শন নিয়ে ওঠেন চাঁদের ভেলায়, ঈগল এসে লাগে অ্যাপোলো—11 যানে। তখন আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন অ্যাপোলো—11 যানে চড়ে কলিন্সের সঙ্গে পৃথিবীতে ফিরে আসেন 25 শে জুলাই 1969, এই অভিযানের বিস্ময় কাটাতে না কাটাতেই 14 ই নভেম্বর আমেরিকা পাঠায় অ্যাপোলো—12, এবারকার অভিযাত্রী চার্লস্ কনরাড্, রিচার্ড গর্ডন ও অ্যালান বীন। কনরাড ও বীন এবার চন্দ্রপৃষ্ঠে আরো অনেকক্ষণ কাটিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে, বহু ছবি তুলে এবং 45 কিলো পাথর সংগ্রহ করে ফিরে আসেন, এরপর আমেরিকা পাঠায় অ্যাপোলো—13। কিন্তু নানা যান্ত্রিক গোলযোগে অভিযাত্রীরা মহাশূন্যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন এবং শেষপর্যন্ত তাঁরা পৃথিবীতে, ফিরে আসেন।

এবার রাশিয়া দীর্ঘদিন পরে আবার প্রতিযোগিতায় নামে। 1970 সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমদিকে পাঠায় লুনা—16 নামক চন্দ্রযান। ঐ যানে ছিল কতকগুলি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। ঐ সকল যন্ত্র চাঁদে ছাড়া পেয়ে মানুষের মতই নানান নমুনা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে। নভেম্বরের মাঝামাঝি লুনা—17 নামক যান যায় চন্দ্রে—সঙ্গে নিয়ে যায় আট চাকার একটা বিশেষভাবে নির্মিত গাড়ী, যাকে আমরা বলতে পারি চাঁদের (লুনোখদ)। 17 ই নভেম্বর থেকে চাঁদের "Sea of Rains" অঞ্চলে এই লুনোখদ চলছে আর এ পর্যন্ত 1,0022 মিটার পথ পরিক্রমা করে ক্রমাগত নানা ছবি পাঠাচ্ছে। এই টাক্সি খাদ ও বড় বড় পাথর এড়িয়ে চলছে।

এইভাবে চন্দ্রে যাবার বহুদিনের স্বপ্ন আস্তে আস্তে এক সময় মানুষের পূরণ হয়।

C/o বেলা মুখার্জী, মধ্যমগ্রাম ১নং দেবীগড়, মধ্যমগ্রাম,
24-পরগণা।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়োজিত

বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প প্রতিযোগিতা

বিষয়—বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য

প্রথম পুরস্কার 40 টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার 30 টাকা, তৃতীয় পুরস্কার 20 টাকা।

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য

প্রথম পুরস্কার 30, টাকা দ্বিতীয় পুরস্কার 25 টাকা, তৃতীয় পুরস্কার 20 টাকা।

—নিয়মাবলী—

- মার্জিন সহ পৃষ্ঠার একদিকে পরিস্কার হস্তাক্ষরে গল্প লিখে পাঠাতে হবে।
- গল্প 400 শব্দের মধ্যে লিখতে হবে।
- নীচের কুপনটি পূরণ করে গল্পের সঙ্গে পাঠাতে হবে।
- প্রেরিত গল্প ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে না।

পুরস্কৃত গল্প কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দপ্তরে গল্প পাঠাবার শেষ তারিখ 31 জুলাই 1984।

প্রতিযোগীর নাম ………………………… বয়স……
ঠিকানা……………………………………………
বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা………………………………
……………………………………………………
শ্রেণী……………………রচনার বিষয়………………
প্রতিযোগীর স্বাক্ষর………………………………
প্রধান শিক্ষক / শিক্ষিকার স্বাক্ষর…………………

প্রশ্নোত্তরে রসায়ন

চিহ্ন, সঙ্কেত, যোজ্যতা

অমরনাথ রায়

এবারে একটু নতুন ভাবে রসায়ন বিজ্ঞানের পাঠ শুরু করা যাক। শুরু করি রসায়নের বর্ণ পরিচয় থেকে, তার মানে একেবারে গোড়া থেকে—চিহ্ন, সংকেত, যোজ্যতা ও রাসায়নিক সমীকরণ থেকে। তোমরা তো জানই যে প্রকৃতিজাত সাধারণ মৌলগুলি সংখ্যায় 92টি। এক একটি মৌলের নাম সংক্ষেপে যা দিয়ে ব্যক্ত করা হয়, তাকে আমরা বলি চিহ্ন। আবার একটি মৌলের অপর একটি মৌলের সঙ্গে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হবার ক্ষমতাকে আমরা বলি যোজ্যতা। যোজ্যতা মৌলের মত যৌগ মূলকেরও থাকে। বিভিন্ন মৌলের চিহ্ন ও যোজ্যতা জানা থাকলে যৌগের সঠিক আণবিক সংকেত আমরা গঠন করতে পারি। তা ছাড়া বিভিন্ন যৌগের আণবিক সংকেত ঠিকমত লিখতে জানলে আমরা রাসায়নিক সমীকরণের সাহায্যে যে কোনও রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ব্যক্ত করতে পারি। কাজেই এসো, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আমরা চিহ্ন, যোজ্যতা, সংকেত ও সমীকরণকে বুঝে নিতে চেষ্টা করি।

(1) সিলভার (Silver) মৌলটির চিহ্ন S না হয়ে Ag হলো কেন?

উত্তর ঃ সিলভার ও সালফার উভয়েরই ইংরেজী নামের আদ্যক্ষর S, সালফারকে বোঝাতে আমরা S চিহ্ন ব্যবহার করি। একই চিহ্ন দিয়ে দুটি মৌলকে তো বোঝানো যায় না; সিলভারকে তাই তার ল্যাটিন নাম Argentum থেকে আহরণ করা Ag চিহ্ন দ্বারা বুঝিয়ে থাকি।

(2) সংকেত মৌলের হয়, যৌগেরও হয়। ফসফরাস নামক মৌলটির সংকেত P_4 রাখা হয়েছে কেন?

উত্তর ঃ ফসফরাস মৌলের একটি অণুতে চারটি ফসফরাস পরমাণু থাকে বলে ফসফরাস মৌলটির আণবিক সংকেত P_4।

(3) 'পারমাণবিকতা' কি? ওজোন গ্যাসে অক্সিজেনের পারমাণবিকতা কত?

উত্তর ঃ একটি মৌলের অণুতে ঐ মৌলের যত সংখ্যক পরমাণু থাকে, সেই সংখ্যাটিকে বলা হয়, ঐ মৌলের পারমাণবিকতা বা atomicity। ওজোন গ্যাসের আণবিক সংকেত O_3। কাজেই ওজোন গ্যাসে অক্সিজেনের পারমাণবিকতা হলো তিন। লক্ষ্য কর, ওজোন গ্যাসের একটি অণু তিনটি অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে গড়া।

(4) Cl_2 এবং 2Cl এর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ Cl_2 লিখলে বুঝতে হবে ক্লোরিন গ্যাসের একটি অণু। আর 2Cl লিখলে বুঝতে হবে 2টি ক্লোরিন পরমাণু।

(5) নাইট্রেট ও নাইট্রাইট মূলকের সংকেত কি? ঐ দুই মূলকের কোন্‌টির যোজ্যতা কত?

উত্তর ঃ নাইট্রেট মূলকের সংকেত NO_3 এবং নাইট্রাইট মূলকের সংকেত NO_2। উভয় মূলকেরই যোজ্যতা এক।

(6) 'মিথেন' যৌগের আণবিক সংকেত কি? ঐ যৌগে কার্বন পরমাণুর যোজ্যতা কত?

উত্তর ঃ মিথেন যৌগের আণবিক সংকেত CH_4। দুটি মৌল C এবং H দ্বারা এই যৌগটি গড়া। গঠিত হবার সময় C তার যোজ্যতা দিয়েছে H-কে এবং H তার যোজ্যতা দিয়েছে C-কে। H-এর যোজ্যতা এক, কাজেই CH_4 যৌগে কার্বনের যোজ্যতা 4।

(7) নীচে লেখা কয়েকটি মৌলের একাধিক যোজ্যতা আছে। কোন মৌলের যোজ্যতা কত?

(ক) মার্কারী (খ) আয়রন (গ) টিন

উত্তর ঃ (ক) 1 এবং 2 (খ) 2 এবং 3 (গ) 2 এবং 4।

(8) আস (ous) এবং ইক (ic) যৌগ বলতে কি বোঝ?

উত্তর ঃ যে সব মৌলের একাধিক যোজ্যতা আছে, তারা যদি তাদের কম যোজ্যতার সাহায্যে কোনও যৌগ গঠন করে তবে সেটি হবে আস (ous) যৌগ। আর সেই একই মৌল যদি তার বেশী যোজ্যতার সাহায্যে যৌগ গঠন করে, তবে সেটি হবে ইক (ic) যৌগ, যথা ঃ ফেরাস ক্লোরাইড, $FeCl_2$, এখানে Fe-এর যোজ্যতা 2 কিন্তু ফেরিক ক্লোরাইডে ($FeCl_3$) Fe-এর যোজ্যতা 3।

(9) $2H + O \rightarrow H_2O$ একটি সামঞ্জস্যহীন সমীকরণ। কেন এই সমীকরণের সামঞ্জস্যবিধান করা দরকার?

উত্তর ঃ ভরের নিত্যতা সূত্র ও ডালটনের পরমাণুবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যেই ঐ সমীকরণের সামঞ্জস্যবিধান করা একান্ত দরকার।

(10) কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপের সৃষ্টি বা হ্রাস বোঝাতে সাধারণভাবে কোন চিহ্ন ব্যবহার করা হয়? ঐ চিহ্নের আগে (−) চিহ্ন অথবা (+) চিহ্ন বসানো হলে কি বুঝতে হবে?

উত্তর ঃ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপের সৃষ্টি বা হ্রাস বোঝাতে সাধারণভাবে ΔH চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। তাপমোচী (Enothermic) বিক্রিয়া বোঝাবার জন্যে ΔH এর আগে (−) চিহ্ন এবং তাপগ্রাহী (Endothermic) বিক্রিয়া বোঝাবার জন্যে ΔH এর আগে (+) চিহ্ন বসানো হয়। [ক্রমশঃ]

NB/T-99A, নিউট্রাফিক, খড়্গপুর

প্রোফেসর ব্রহ্মের সমুদ্র সন্ধান

সুধীন্দ্র সরকার

প্রোফেসর ব্রহ্ম ইদানিং একটু বেশি চুপচাপ থাকেন। ল্যাবরেটরি ছেড়ে বেরোন না বললেই চলে। ওঁর প্রথম আবিস্কার লাইফ এনলার্জার মেশিন নিয়ে বেশ হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল বৈজ্ঞানিক মহলে। আমেরিকার সাইন্স রিসার্চ ব্যুরোর অধিকর্তা ডঃ নীল উইলসন ওঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আমেরিকায়। কিন্তু, দুর্ভাগ্য এইযে, সামান্য একটু ভুলে লাইফ এনলার্জার সমেত রিসার্চ পেপারগুলো পর্য্যন্ত এখন আর কিছুই নেই ওঁর হাতে।

রাগে দুঃখে উনি দেশত্যাগী হলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে বর্ত্তমানে উনি ঠাঁই নিয়েছেন পুরীতে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী এই শহরটা বেশ পছন্দ ওর। নির্ঝঞ্ঝাটের একটা বাড়িও ভাড়া পেয়ে গেছেন সমুদ্রের ধারে। বাড়িটা ভাঙ্গাচোরা হলেও, নিঃশব্দে কাজ করার পক্ষে উপযুক্ত।

অতবড় বাড়িতে প্রোফেসরের সঙ্গী বলতে শুধু একজন। রান্না—বান্না, দোকান-বাজার, এমন কী প্রোফেসরের অ্যাসিসট্টেন্টও সেই। হারু মহান্তি প্রোফেসরের রাঁধুনী, কাম গার্জেন কাম হেল্পার। আগে হারুর কাজ ছিল চুরি করা। কিন্তু, প্রোফেসরের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে, চুরি-টুরি ছেড়ে দিয়ে এখন ওঁর ডানহাত। প্রোফেসরের বিজ্ঞান সাধনার সাফল্যের প্রথম সাক্ষী হারুই।

ইদানিং একটা জগৎবিখ্যাত পুরোনো যন্ত্র ওঁর গবেষনার বিষয়। যন্ত্রটির নাম বহুল পরিচিত। কল্পবিজ্ঞান গল্পের বিখ্যাত লেখক এইচ-জি-ওয়েলস যে টাইম মেশিনের গল্প পৃথিবীকে শুনিয়েছিলেন, সেই টাইম মেশিন উনি তৈরী করেছেন নিজের হাতে। গল্পের যন্ত্রের সাহায্যে যেমন সময়কে পাড়ি দেওয়া যেত, প্রোফেসরের যন্ত্রে অতীত এবং ভবিষ্যতের জীবন্ত ছবি দেখা যাবে। কখনও সে ছবি হবে লক্ষ কোটি বছর আগের, কখনও পরের। উনি যন্ত্রটার নাম দিয়েছেন টাইম-ভিসন।

যদি হঠাৎ কোন পর্যটক পুরীর সাগরবেলায় হাঁটতে হাঁটতে সেই নির্জন পরিবেশের বাড়িটাতে হাজির হন, তাহলেই দেখতে পাবেন, দরজার গায়ে লাগানো ট্যাবলেটে লেখা—"প্রবেশ নিষেধ।" কৌতূহলবশতঃ দরজা ঠেলে ঢুকলেই নজরে পড়বে, প্রোফেসর ব্রহ্ম একটা তেলের পিপের সাইজের যন্ত্রের দরজা খুলে কখনও হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকছেন, কখনও আবার বাইরে বেরিয়ে এসে যন্ত্রের গায়ে কী সব লাগাচ্ছেন। যন্ত্রটার মাথায় শোভা পাচ্ছে ফ্লেক্সিবিল পাইপে লাগানো একটা কম্প্যুটার ক্যামেরা, অ্যাণ্টেনা এবং আরোও টুকিটাকি অনেক যন্ত্রপাতি।

হারু বাজারে গিয়েছিল। বাড়ি থেকে বাজারের দূরত্ব অনেকটা। যেতে আসতে বেশ খানিকটা সময় লাগে বলে প্রোফেসর ওকে একটা সাইকেল কিনে দিয়েছিলেন। বাজার ছাড়া সাইকেল চেপেই হারু অন্য সব কাজ সারে।

"ক্রিং ক্রিং !" সাইকেলের ঘণ্টি শোনা গেল। হারু ফিরল বাজার করে।

"এতো দেরী হল যে আজ ?" টাইম-ভিসনের ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করলেন প্রোফেসর।

"দেরী কী আর ইচ্ছে করে করি ? সাইকেল স্ট্যাণ্ডে দাঁড় করিয়ে হারু টাইম-ভিসনের কাছে গেল।" আনাজ-পত্রের দাম আগুন। গোটা বাজার চরকির মতো ঘুরে কিনতে হয় !"

প্রোফেসর মৃদু ঘাড় নেড়ে নিজের কাজ করতে থাকেন। টাইম-ভিসনের ফরওয়ার্ড সার্কিট বেশ গড়বড় করছে। ফিউচার টাইমিংয়ে কোন ছবি দেখা যাচ্ছে না ভিসন টিউবে। পাস্ট টাইমিংয়ের ছবি অথচ নির্ভুল। হারু হামাগুড়ি দিয়ে যন্ত্রের ভেতরে ঢুকল। নীল রঙের একটা বোতাম টিপলেন প্রোফেসর। টাইম ভিসনের দরজা আপনিই বন্ধ হয়ে গেল। টাইম ভিসনের ভেতরটা গম্বুজের তলার মত গোলাকার। কনকেভ। আবছা সবুজ আলোয় ভরে আছে টাইম চেম্বার। প্রোফেসর কয়েকটা রঙিন বোতাম টিপতেই স্ক্রিনে কতকগুলো আলোর রেখা নড়ে চড়ে উঠল। এ স্ক্রিন সাধারণ টি-ভি বা সিনেমার মত নয়। গোলাকার সারকারিনা স্ক্রিন। টাইম চেয়ারে বসে অতীত এবং ভবিষ্যতের ছবি দেখতে দেখতে মনে হবে, দর্শক নিজেও সেই সময়ে ফিরে গেছেন। সময় এগিয়ে বা পিছিয়ে যাওয়ার জন্য তার নিজের কোন পরিবর্ত্তন হবে না।

প্রোফেসর টাইম চেয়ার থেকে উঠে নীচে উবু হয়ে বসে, হারুকে চেয়ারে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী দেখতে চাস বল ?"

হারু বাজারের থলিটা কোলের ওপরে রেখে অবাক চোখে সামনে-পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে দেখে বিজ্ঞের মত বলল, "দুশো বছর পরে আমাদের সেই পুরোনো গাঁয়ের চেহারাটা কেমন হবে ?"

প্রোফেসর ঘাড় নাড়লেন, "ওটা দেখানো যাবে না।"

"কেন ? নিজের দেশের ওপর এত রাগ কেন ?"

"রাগ-টাগ নয়। তাহলে তো টাইম-ভিসনকে পশ্চিম-বঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। কেননা, টাইম-ভিসন সেখানকারই ছবি দেখাতে পারবে, যেখানে ওকে রাখা হবে। আর কোন মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে, টাইম চেয়ারে বসলেই হবে। তাছাড়া, একটা ত্রুটি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। সময়কে এগিয়ে এখনই নিয়ে যাওয়া যাবেনা। তোকে বরং অতীতের কিছু ঘটনা দেখাতে পারি।"

"ঠিক আছে, আমার ছোটবেলায় একটা দিন দেখান দেখি।"

"তোর বয়স নিশ্চয়ই চল্লিশ হবে ?''

"হুঁ, তা হবে।"

"তাহলে তোর পাঁচবছর বয়সে ফিরে যাই।" প্রোফেসর হাঁটু মুড়ে উঠলেন। টাইম-ভিসনের যা উচ্চতা তাতে কোন লোকই এখানে দাঁড়াতে পারবে না। হারুর মাথায় একটা তারের কয়েল পরিয়ে দিলেন। সেই কয়েলের একটা প্রান্ত টাইম-ভিসনের কী-বোর্ডে প্রবেশ করিয়ে বললেন, "তোর স্মৃতি থেকে ছোটবেলাকার ছবি এই স্ক্রিনে জীবন্ত দেখতে পাবি।" রিভিউ স্লাইডার বাঁ দিকে একচুল সরিয়ে দিতেই, ইনডিকেটর হ্যাণ্ড নির্দেশ করল 1900 থেকে 1950 সালে। লাল ও হলুদ বোতাম দুটো একসঙ্গে টিপতেই স্ক্রিন জুড়ে রঙিন আঁকিবুকি ফুটে উঠল। নড়ে চড়ে বসল হারু।

স্ক্রিন জুড়ে দেখা গেল আমবাগান। সেখানে একটা পাঁচ-ছয় বছরের ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর বগলে একটা শ্লেট, আর কিছু বই। ঠিক তখনি দূরে কে যেন আসছিল। ছবির ছেলেটা তখন আমগাছের ডালে বসে আম খাচ্ছে। যে লোকটাকে এতক্ষণ দূরে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, তার চেহারাটা স্পষ্ট হল। লোকটা আমগাছের নীচে এসে ওপরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করল। ছোট্ট ছেলেটা গুটি গুটি পায়ে নেমে এল গাছ থেকে।

টাইম চেয়ারে বসে হারু 'বাবা' বলে ডাক দিতেই স্ক্রিন থেকে মিলিয়ে গেল ছবি।

প্রোফেসর সুইচ অফ করে দিয়ে বললেন, "কথা বললি, বলে, তোর স্মৃতি বাধা প্রাপ্ত হতেই ছবি কেটে গেল ! আমারই ভুল হয়েছিল, তোকে বারণ করা হয়নি যে কথা বলবি না।"

"মাথাটা কেমন যেন ঝিম মেরে আছে।" হারু বলল।

"একটু পরেই সেরে যাবে।" প্রোফেসর হাসলেন, "স্কুল পালিয়ে আম চুরি করতে গিয়েছিলি ?"

"স্কুল পালিয়ে নয়। বোধহয় স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল আগে।"

"বাবা পরে পিটুনি দিয়েছিলেন ?

"না। এই ঘটনার দিনই বাবাকে সাপে কেটেছিল।" হারু ধরা গলায় বলল, " পরেরদিনই বাবা মারা যান।"

হারুর মাথা থেকে কয়েল খুলতে খুলতে প্রোফেসর কথার প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, "ছোটবেলার দিনগুলো মন্দ ছিল না। আর কিছু না হোক, লোকে খেয়ে পরে বেঁচে থাকত।"

"জিনিসপত্রের দাম যে ভাবে বাড়ছে, বৈজ্ঞানিকরা এর জন্যে কিছু করতে পারে না ?" হারু জিজ্ঞেস করল।

"এখানেই বিজ্ঞান হার মেনেছে। এ সবই তো মানুষের সৃষ্টি।"

"এই যে চারদিকে এত খরা চলছে। মাঠ-ঘাট ফেটে ফুটি-ফাটা, চাষ-আবাদ হচ্ছেনা। ফসল ফলছে না। এর জন্যে তো বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসা উচিত।"

"এসব কাজ যে একটু-আধটু হচ্ছেনা, তা নয়। কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিতো অনেকেই আকাশ থেকে নামিয়াছেন। তবে,

অনেক ব্যয় সাধ্য। ভারতবর্ষের মত গরীব দেশে তা কী সম্ভব?"

"পুরীতে এতবড় সমুদ্র। এতজল। তবু কেন খরার সময় সমুদ্রের জলকে ব্যবহার করা হচ্ছে না?"

"কে বললে হচ্ছে না? সমুদ্রের জলকে চাষের উপযোগী জলে পরিবর্তন করেছেন বৈজ্ঞানিকরা। তবে সবই ব্যয়বহুল।"

"সবই হচ্ছে, অথচ কিছুই হচ্ছে না।" হাবু উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। বাজারের থলিটা হাতে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, "আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি। আপনি একটু পরে চান-টান সেরে আসুন। অনেক বেলা হয়ে গেল আজ।"

হাবুর কথা বলার ধরণ দেখে প্রোফেসর নিজের মনে হেসে উঠলেন।

আদিগন্ত সমুদ্রের জলরাশি হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। উত্তাল ঢেউয়ে রোদ পড়ে রুপোলি জল আছড়ে পড়ছিল বেলাভূমিতে। আকাশের নীল সমুদ্রের নীলের কাছে বেশ ফিকে।

ধীর পায়ে সমুদ্রে নামলেন প্রোফেসর। এদিকটায় ভিড় নেই বললেই চলে। দূরে দেখা যাচ্ছিল, বেশ কিছু স্নানার্থী দাপাদাপি করছিল জলে।

সমুদ্রের জলে গা ভেজাতেই প্রোফেসরের মাথায় এক নতুন চিন্তার জট পাকাতে শুরু করল। সমুদ্রের নোনা জল মুখে দিতেই উনি ভাবলেন, আজ থেকে কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীতে জল সৃষ্টির আদিপর্বে, মহাপ্লাবনের জলে যখন চারিদিক ভেসে গেল, তখনও কী সমুদ্রের জল এত নোনতা ছিল? কোন্ কোন বিজ্ঞানী তো বলেন, প্রথম সমুদ্রের জল ছিল মিষ্টি। টাইম ভিসনকে সমুদ্রে নামিয়ে যদি ষাট কোটি বছর পেছনে ফিরে যাওয়া যায়, তাহলেই তো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। হাতে-নাতে প্রমাণ পাওয়া যায়, আদি সমুদ্রের জল নোনতা ছিল, না মিষ্টি?

প্রোফেসর তড়িঘড়ি ভিজে গায়েই বাড়ি ফিরে এলেন। টাইম-ভিসনের দরজা খুলে খুঁটিনাটি পরীক্ষা শেষ করলেন। টাইম-ভিসনের মাথায় ফ্লেক্সিবল পাইপে যে কম্প্যুটার ক্যামেরাটা বসানো ছিল, সেটা মৃদু দুলছিল হাওয়ায়। সেটাকে বেশ জোরে ফিক্সড করলেন বডির সঙ্গে। যেতে বেশি নড়া চড়া করতে না পারে। এই কম্পুটার ক্যামেরা যে কোন পরিবেশে ছবি তুলতে সক্ষম। এর সাহায্যেই অতীত এবং ভবিষ্যতের ছবি কখনও সময়কে এগিয়ে, কখনও পিছিয়ে তোলা হয়। এই ক্যামেরাই আবার টাইমভিসনের সারকারিনা স্ক্রিনে সরাসরি ছবি পাঠায়।

এখনই টাইম-ভিসনের গায়ে একটা ইনলেট আউটলেট টিউব বসাবার কাজ তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে। যখন টাইমভিসন সমুদ্রে ডুবে থাকবে, তখন ইনলেট টিউব দিয়ে সমুদ্রের জলকে টাইম ভিসনের ভেতর দিয়ে আবর্ত্তিত করে, আউটলেট টিউব দিয়ে বের করে দিতে হবে। জলের নুন পরীক্ষা করার জন্য টাইম ভিসনের ভেতরে থাকবে, টিউবে ট্যাপের ব্যবস্থা।

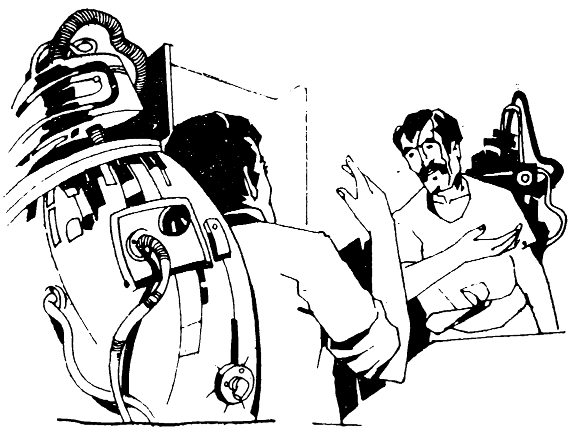

বেলা কত হল খেয়াল আছে ?

যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজে লেগে পড়লেন প্রোফেসর। ইতিমধ্যে হাবু দুবার ডেকে গেছে ওঁকে। প্রোফেসর কোন সাড়া দেননি। শেষমেষ বিরক্ত হয়ে চেঁচামেচি শুরু করল ও, "বেলা কত হল খেয়াল আছে?"

প্রোফেসর নিজের কাজ করতে করতে উত্তর দিলেন, "তুই খেয়ে নে। আমার কিছু দরকারী কাজ সারতে হবে।"

"এখনও তো গোটা রাত পড়ে আছে। তখন কাজ করবেন।"

"রাত্রে একটা বড়-সড় এক্সপেরিমেণ্ট করব।"

"রাতের এখনও অনেক দেরী।"

"সব রেডি রাখতে হবে তো?"

"চলুন তো।" হাবু প্রোফেসরের হাত ধরে টানতে শুরু করল, "আগে শরীর, পরে কাজ।"

আর কথা বাড়ালেন না প্রোফেসর। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বললেন, "আজ আমার সঙ্গে রাত জাগবি।"

দুজনে পা বাড়াল ডাইনিং হলের দিকে।

সমুদ্রসৈকতে নিকষ কালো অন্ধকার। জনমানবের কোন চিহ্ন নেই। সাগরতীরের গা-ঘেঁষা বাড়ি এবং হোটেলগুলোর আলো নিভে গেছে অনেক আগে। স্বর্গদ্বারের রাস্তা খাঁ-খাঁ। রাতের অন্ধকারকে ভয়াবহ করে তুলেছে সমুদ্রের গর্জন।

প্রোফেসর এবং হাবুকে দেখা গেল, ভূতের মত সমুদ্রের তীরে ঘোরাফেরা করতে। বালির ওপরে একটা ট্রলি। ট্রলির ওপরে রাখা আছে টাইম-ভিসন। ট্রলিটায় কোন চাকা নেই। ট্রলির নীচে স্কি করার মত লম্বা

কাঠের পাত লাগানো। দুজনে মিলে ট্রলি সমেত টাইম ভিসনকে ঠেলতে ঠেলতে সমুদ্রের কাছাকাছি নিয়ে এল! প্রোফেসর টাইম ভিসনের ভেতরে ঢুকে বললেন, "আমি দরজা বন্ধ করার পর ট্রলিটা ঠেলে সমুদ্রে নামিয়ে দিবি, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত টাইম ভিসন পুরোপুরি জলে ডুবে যাচ্ছে।"

হাবু ঘাড় নাড়ল। ট্রলি সমেত টাইম ভিসনের উচ্চতার একটা মাপ করে নিল মনে মনে। যন্ত্রটার বসানো কম্প্যুটার ক্যামেরাটা ওর গলা অব্দি।

প্রোফেসর ওর হাতে একটা স্টপ ওয়াচ দিয়ে বললেন, "আমি দরজা বন্ধ করার দশ মিনিট পরেই ট্রলিটা জল থেকে টেনে পাড়ে তুলবি। আমার কাজ মিনিট পাঁচেকের।" টাইম ভিসনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ট্রলি একটু ঠেলতেই হুশ করে নেমে গেল জলের মধ্যে। বেশি ঠেলতে হল না। কেননা, ট্রলি বালিতে বসে যাওয়ার ফলে টাইম মেশিনের মাথা ডুবে গেল জলে।

কোমর জলে দাঁড়িয়ে হাবু টাইম ভিসনটা ধরে ছিল। সমুদ্রের ঢেউ ভেঙ্গে যখন পাড় থেকে ফিরে আসছিল, পায়ের তলার বালি নেমে যাচ্ছিল হুশ হুশ করে। স্টপ ওয়াচে তখন মাত্র চার মিনিট সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এখনও ছ মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ওকে। সময় যেন কাটতেই চাই ছিল না। সেই নিস্তব্ধ পরিবেশে সমুদ্রের ঢেউগুলো মনে হচ্ছিল, বড় বেশি ভয়ঙ্কর! হঠাৎ একটা বড় সড় ঢেউ ভাঙ্গল, ঠিক টাইম ভিসনের মাথার ওপর। সাপের ফণার মত দুলে উঠল কম্প্যুটার ক্যামেরা। ঢেউয়ের ধাক্কায় টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়ল হাবু। সেই সঙ্গে ট্রলি সমেত টাইম ভিসনকে কে যেন ছুঁড়ে ফেলে দিল ডাঙ্গায়। বালির ওপরে। কাৎ হয়ে পড়ে রইল সেটা। হাবু জলে নাকানি চোবানি হয়ে কোন ক্রমে পাড়ের দিকে ছুটল। স্টপ ওয়াচটা জোর করে মুঠোয় ধরে রেখেছিল ভাগ্যিস! স্টপ ওয়াচের রেডিয়াম কাঁটা জানিয়ে দিল, দশ মিনিট কেটে গেছে অনেক আগেই।

টাইম ভিসনের কাছে যেতেই আতঙ্কে শিউরে উঠল। দরজা খোলা। যন্ত্রটার মাথায় বসানো কম্প্যুটার ক্যামেরাটা নেই। শুধুমাত্র ফ্লেক্সেবিল পাইপটা দোমড়ানো মোচড়ানো। হাবু হামাগুঁড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখল, প্রোফেসরও বেপাত্তা। সর্বনাশ! উনি কী জলে ডুবে গেলেন নাকি? দিশেহারা হাবু বাইরে বেরিয়ে চিৎকার করে উঠল ভয়ে, "বাবু...!' হঠাৎ অন্ধকার সমুদ্রের কালো জলে কী যেন নড়ে উঠল। হাবু পড়ি-কি-মরি করে নামল জলে। কখন মাথা নিচু করে, কখনও লাফ দিয়ে। সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাত বাঁচিয়ে সেই গলা জলে পৌঁছে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

প্রোফেসরের অবস্থা তখন সঙ্গীন। সমুদ্রের নোনা জল খেয়ে অবস্থা কাহিল। উনি হাবুকে কাছে পেয়ে কেঁদে উঠলেন ভেউ ভেউ করে।

হাবু কোন রকমে প্রোফেসরকে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এল পাড়ে।

বাকী রাতটুকু প্রোফেসরের সেবা শুশ্রূষা করেই কেটে গেল হাবুর। সেবা করার ফাঁকে হাবু জেনে নিয়েছিল, প্রোফেসর কী করে টাইম ভিসনের ভেতর থেকে ছিটকে সমুদ্রের গলা জলে গিয়ে পড়লেন।

প্রোফেসরের কথায়, "টাইম ভিসনের দরজা বন্ধ করার মিনিট দুয়েক পরে প্রাথমিক কাজ কর্ম সেরে, সময়কে ত্রিশ কোটি বছর পেছনে যেই সরিয়েছি, তখনই ঘটে গেল এক অভাবনীয় কাণ্ড! টাইম ভিসনের সারকারিনা স্ক্রিনে ফুটে উঠল বিচিত্রাকায় ডাইনোসরদের ছবি। প্রথমেই যদি রিভিউ স্লাইডার মাইনাস ইনফিনিটির থেকে শুরু করে, ষাট কোটি বছর আগে সময়কে নিয়ে গিয়ে কাজ করতাম, তাহলে হয়ত এই বিপদ হত না। কেননা, ষাট কোটি বছর আগে তো ডাইনোসররা পৃথিবীতে আসেনি। ওদের চেহারা দেখে এতই হত চকিত হয়ে গেলাম যে, বুদ্ধি ভ্রম হল আমার। সমুদ্রের জলের নুন পরীক্ষা করার কথা তখন বেমালুম·ভুলেই গেলাম। আমার চারপাশে তখন শয়ে শয়ে ছোট বড় ডাইনোসরেরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সারকারিনা স্ক্রিনে। ওরা প্রত্যেকেই পরস্পরের সঙ্গে মারামারিতে মত্ত। ডাইনোসরদের দৌরাত্মে তোলপাড় হচ্ছিল সাগরের জল। স্ক্রিনে ওদের অতিকায় চেহারা ছাড়া সমুদ্রের আর কোন বস্তু নজরে পড়ল না। একটা বৃহৎ মোসাসরস্ দুপাটি ধারালো দাঁত নিয়ে তেড়ে এল টাইম ভিসনকে গিলে খাবার জন্যে। গোটা স্ক্রিন জুড়ে তখন একটা বৃহৎ দাঁতাল মুখ গহ্বরের ছবি! তারপরই সাদা হয়ে গেল স্ক্রিন। ভাবলাম, ক্যামেরাটা গণ্ডগোল করল নাকি? তারপরই বিশ্রীভাবে দুলে উঠল টাইম ভিসন। অন্ধকার হয়ে গেল ভেতরটা। ছিটকে পড়ে গেলুম চেয়ার থেকে। কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম, তবে কী মোসাসরস্‌টা টাইম ভিসনকে গিলে খেয়ে ফেলল? দরজা খুলে বেরিয়ে যাব, কিন্তু কোন বোতাম তখন কাজ করছিল না। তারপরই এল আর একটা জোর ধাক্কা। টাল সামলাতে না পেরে গড়িয়ে গেলাম দরজার ওপরে। তারপরই দেখলাম আমি সমুদ্রের ওপরে ভাসছি।"

"ওই দানব গুলোই তাহলে ক্যামেরাটা খেয়ে নিয়ে, যন্ত্রটাকে ডাঙ্গায় ছুঁড়ে দিয়েছিল নিশ্চয়ই?" হাবু বিড় বিড় করল মনে মনে।

48/1, কলুপাড়া লেন, কলকাতা-31

আবিষ্কারের গল্প

ট্রাম গাড়ীর কাহিনী

মধুসূদন পাল

'ট্রামগাড়ী' নাম হ'ল কেন ? ট্রাম মানে কাঠের বরগা। আমেরিকার লোকেরাই নাকি ঐ নামটা দিয়েছিল আর সর্ব-প্রথম ট্রামগাড়ীর প্রলচন হয় ঐ আমেরিকারই নিউইয়র্ক শহরে, আজ থেকে ১৪৮ বছর আগে।

আমাদের কলকাতায় প্রথম ট্রাম চলতে থাকে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু তা ছিল মালটানা ট্রাম। যাত্রীবাহী ট্রাম চলতে শুরু করে আরও পরে, ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে।

প্রথম যখন কলকাতায় ট্রাম গাড়ীর চলন হ'ল তখন তাকে সত্যিকারের ট্রাম গাড়ীই বলা চলে, কারণ তারও লাইনগুলো ছিল কাঠের তৈরী। শহরের মাত্র দু'মাইল রাস্তা জুড়ে যে গাড়ী চলত। কিন্তু তাতে লোক বইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না, এখনকার লরীর মত মাল বয়ে নেওয়াই ছিল তার কাজ। একটি তেজীয়ান ঘোড়া সেই গাড়ী টেনে নিয়ে ছুটত। লাইন পাতবার কারণ আর কিছু না তখনকার এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় তেজী ঘোড়াদের পক্ষেও ভারী ওজনের গাড়ী টানা বড় সহজ ছিল না। রাস্তা যত মসৃণ হবে গাড়ীর চাকা তত সহজে ঘুরবে। এইজন্যই লাইনের দরকার। সমস্ত রাস্তাটা তো আর লাইনের মত মসৃণ করা যায় না, তাই শুধু চাকাগুলোর প্রয়োজনমত জায়গা নিরে লাইন বসানো। 2টি লাইনের মধ্যে ব্যবধান ছিল 3 ফুটের একটু বেশী—3 ফুট $3\frac{3}{8}$ ইঞ্চি। শোনা যায় সরকার আর রেল কোম্পানী একমত হয়ে এর যাবতীয় খরচ বহন করেছিলেন।

কিন্তু হ'লে হবে কি, সে ট্রাম মাস কয়েকের বেশী চলেনি। লোকসান শুরু হতেই বন্ধ করে দিতে হয়। তারপর প্রায় 6/7 বছর ট্রামলাইনগুলিই শুধু পড়ে রইল, ট্রামের আর পাত্তা নেই।

তখন এগিয়ে এল একটি বিলিতী কোম্পানী। তারা ভার নেবে কলকাতার ট্রামওয়ের। নতুন করে লাইন—টাইন সাফ করা হ'ল। কোম্পানীর কর্তারা বললেন, শুধু মাল নয়, এবার ট্রামে যাত্রীদেরও নিতে হবে। শেষ পর্যন্ত মাল টানা একদম উঠে গিয়ে যাত্রী আনা নেওয়ার জন্যই ট্রাম চলতে লাগল।

কি রকম দেখতে ছিল সেই ট্রাম ? তার একটা নমুনা কলকাতার বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ামে আছে। গাড়ীর মাথার ওপর ছিল শুধু একটা চাল আর চারধার•সব ফাঁকা। ভিতরে ৮।১০ জন লোকের বসবার মত বেঞ্চি পাতা, পাশে লম্বা পাদানীর ওপর দাঁড়িয়ে থাকত কণ্ডাকটার। গাড়ীর সামনে বসত কোচম্যান। বলাবাহুল্য, তখনও ঘোড়া দিয়েই ট্রাম টানানো হত।

খুব তেজীয়ান ওয়েলার ঘোড়া ব্যবহার করা হত এজন্য। তাও অত ভারী গাড়ী টানতে তারাও গলদ্‌ঘর্ম হয়ে যেত। খানিক দূর গিয়েই ঘোড়া বদল করে অন্য ঘোড়া জুড়ে দেওয়া হত। তাই ট্রামওয়ের মাঝে মাঝেই থাকত আস্তাবল। তাছাড়া ঘোড়ার জল খাবার জন্য পথের মাঝে মাঝে লোহার বড় বড় চৌবাচ্চাও রাখা হত। যে চৌবাচ্চার কিছু কিছু এখনও চৌরঙ্গীতে দেখতে পাওয়া যায়। এসব সত্ত্বেও কিন্তু গরমকালে প্রচুর ঘোড়া সর্দি গর্মীতে মারা যেত।

তখন কর্তারা ঠিক করলেন, ঘোড়ায় টানা গাড়ীর পাশাপাশি স্টীম ইঞ্জিন টানা ট্রামও চালাবেন এবং চালালেনও। প্রথমে খিদিরপুরে এবং শেষে চৌরঙ্গী অঞ্চলে এরকম ট্রামও চলতে লাগল, কিন্তু শুধু দিনের বেলা। সন্ধ্যার আগেই সে ট্রাম বন্ধ করে দেওয়া হ'ত সে যুগের অল্প আলোয় রাস্তায় দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য। তাছাড়া ট্রামের ঘোড়াগুলোও স্টীম ইঞ্জিনের বিকট শব্দ বরদাস্ত করতে পারত না।

ইতিমধ্যে কাঠের বরগার বদলে লোহার লাইন চালু হয়ে গেছে। ট্রাম খুব জনপ্রিয়ও হয়েছে। প্রচুর লাভ হচ্ছে কোম্পানীর। তাই তাঁরা ঠিক করলেন, ট্রামকে আরও আধুনিক করতে হবে। ঘোড়ায় টানা বা স্টীম ইঞ্জিনে টানা ট্রাম আর চালানো হবে না—নতুন যুগের বৈদ্যুতিক ট্রামের চলন করতে হবে। ১৯০২ সাল থেকে সেই বৈদ্যুতিক ট্রাম চলতে শুরু করল কলকাতার রাস্তায়। আর এখনও তা চলছে।

এখন তো কলকাতায় পাতাল রেল তৈরী হচ্ছে। ফলে, ট্রামের আদর নিশ্চয়ই অনেকটা কমে যাবে। যতদিন না পাতাল রেলের কাজ শেষ হচ্ছে ততদিন বেঁচে থাকুক ট্রাম।

চাষাপাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ছিপ্পক বর্গের পাখি

অজয় হোম

ছিপ্পক বর্গের (অর্ডার কাপ্রিমালগিফরমেস) পাখিরা একটু অদ্ভুত ধরনের। নিশাচর এবং খাই-মুখ এদের খুব বড়ো। ধরনধারণে পেঁচাদের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও এরা সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাই এদের আলাদা বর্গের মধ্যে ধরা হয়েছে। এই বর্গে দুটি বংশ— ভেকমুখ (পডারগিদি) ও ছিপ্পক (কাপ্রিমালগিদি)।

ভেকমুখ বংশের পাখিদের খাই-মুখ খুব চওড়া। ছিপ্পক বংশের পাখিদের এত চওড়া হয় না। ভেকমুখদের চঞ্চু বেশ শক্তিশালী এবং বাঁকা, চঞ্চুর ডগা বঁড়শির মতো বাঁকানো। চঞ্চুর গোড়ায় খোঁচা খোঁচা সরু লম্বা পালক নাকের ছ্যাঁদাকে ঢেকে রাখে।

ভারতে একটি মাত্র গণ— ভেকমুখ (বাট্রাচোস্টোমাস) এবং দুটি প্রজাতি। একটি প্রজাতিকে (বা হজসনি) দেখা যায় সিকিম, ভূটান, আসামে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণাংশের পাহাড়, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, বাংলাদেশে ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম 300 থেকে 1800 মি উচ্চতার মধ্যে চিরহরিৎ জঙ্গলে। মণিপুরী নাগারা বলে 'স্যামবং', ইং. হজসন'স ফ্রগমাউথ। লম্বায় 27 সেমি. দ্বিতীয় প্রজাতিকে (বা মণিলিজার) দেখা যায় ভারতের পশ্চিমঘাটে কানাড়া ও ত্রিবান্দ্রাম জেলায় 1200 মি. উচ্চতার মধ্যে গভীর জঙ্গল ও তার আশপাশে এবং শ্রীলঙ্কায়। মালয়ালামরা বলে 'মাক্কাচিক্কাটা', ইং. সিলোন ফ্রগমাউথ। লম্বায় 23 সেমি।

ছিপ্পক বংশ

ছিপ্পক বংশে (কাপ্রিমালগিদি) দুটি গণ—হেমতুণ্ড (ইওরোস্টোপোডাস) ও ছিপ্পক (কাপ্রিমালগাস)। হেমতুণ্ড পাখিদের নাকের উপর খোঁচা খোঁচা লোম পালক নেই, আছে দুই কানের উপর ও পাশে লম্বাটে পালক, যেন খাগের কলম গোঁজা। এই গণে দুটি উপজাতি। প্রথম উপজাতি (ইও মাক্রোটিস সেরভিনিকেপস্): বাসস্থান— আসামে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব ও দক্ষিণাংশ, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজো, বাংলাদেশের ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম 1000 মি. উচ্চতার মধ্যে এবং দক্ষিণ ইউনান, বার্মা, মালয় উপদ্বীপ, পেনাং, দক্ষিণপূর্ব থাইল্যাণ্ড, দক্ষিণ ভিয়েতনাম। অসমিয়া নাম 'দিন কূ নাহ্', ইং. বাঁমিজ গ্রেট ইয়ার্ড নাইটজার। ডাকে 'পিইই-হুইইউ-হুইইউ-হুইউউ'। দ্বিতীয় উপজাতি (ইও মা ব্যুরডিল্লনি): বাসস্থান—কেরালার কোট্টাইয়াম, কুইলন ও ত্রিবান্দ্রাম জেলার চিরহরিৎ এবং ভিজে পর্ণমোচীর জঙ্গল, প্রধানত পাহাড়ের পাদদেশে 1000 মি. উচ্চতার মধ্যে। মালয়ালাম নাম 'সাম্বিয়া মুঝাক্কি', ইং. কেরালা গ্রেট ইয়ার্ড নাইটজার। ডাক শিসের মতো 'হুই-হুইইইউ'।

ছিপ্পক বংশের অন্তর্গত ছিপ্পক গণের (কাপ্রিমালগাস) পাখিদের বাসস্থান—ভারত, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণপূর্ব সাইবেরিয়া, পশ্চিম চীন, জাপান এবং পালান দ্বীপপুঞ্জ। ভারত ও তার নিকটবর্তী স্থান দেখা যায় ছটি প্রজাতিতে। প্রথম প্রজাতি-- ছিপ্পক, ছাপ্পা, ডাবচিরি, ডাবনাক (কাপ্রিমালগাস ইণ্ডিকা), ইং. ইণ্ডিয়ান জাঙ্গল নাইটজার। বাসস্থান— পশ্চিম রাজস্থান, কচ্ছ এবং পাকিস্তানের কিছু অঞ্চল ছাড়া ভারতে প্রায় সর্বত্র 2300 মি. উচ্চতার মধ্যে প্রধানত সেগুন ও বাঁশের জঙ্গলে। লম্বায় 29 সেমি। ডাক কিছুটা মধুরতার সঙ্গে বিষাদমাখা 'উক-ক্রুকরুউ', চাঁদনি রাতে দু' সেকেণ্ড অন্তর অন্তর 'চাক-চাক'। দুটি উপজাতি। প্রথম— চিন বাসসা (কা ই কেলারটি), ইং. সিলোন জাঙ্গল নাইটজার। লম্বায় 27 সেমি। ডাকে 'চাক'ম চাক'ম'। দ্বিতীয় (কা ই হাজারি), ইং. হিমালয়ান জাঙ্গল নাইটজার। বাসস্থান— উত্তর পশ্চিম পাকিস্তানের হাজারা জেলা থেকে হিমালয়ের পুবে নেপাল, সিকিম, ভূটান, অরুণাচল, আসামে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণাংশের পার্বত্য অঞ্চল, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজো, বাংলাদেশ থেকে ইওনান, বার্মা, মালয় 3300 মি. উচ্চতার মধ্যে। লম্বায় 32 সেমি। ডাকে 'চাক-চাক চাক্কু-চাক্কু'।

দ্বিতীয় প্রজাতি— ছাপাকি, পাটাক (কা ইওরোপাইয়াস) এর একটি উপজাতি (কা ই আনউইনি), ইং. হিউম'স ইওরোপীয়ান নাইটজার। পরিযায়ী হয়ে আসে এপ্রিল-মে থেকে আগস্ট-সেপ্টেম্বর-এ পাকিস্তান, কাশ্মীর, কচ্ছ,

রাজস্থান, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর। লম্বায় 25 সেমি। ডাকে টিকটিকির মতো 'চাক-চাক চাক'।

তৃতীয় প্রজাতি — শাপকর (কা মাহ্‌রাট্টেনসিস), ইং. সিনড্‌ নাইটজার। বাসস্থান— আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। শীতে কখনোসখনো পরিযায়ী হয় গুজরাট, বোম্বাই এবং পশ্চিমবঙ্গ। ডাকে নরম গলায় 'পররর্‌ পররর্‌'। দিনের বেলায় হঠাৎ উড়লে শোনা যায় 'ক্লাক ক্লাক'।

চতুর্থ প্রজাতি—ঠুকঠুকিয়া (কাপ্রিমালগাস মাকরুরাস), ইং. ইণ্ডিয়ান লংটেইলড নাইটজার, হিন্দি ছুপকা। 4টি উপজাতি। প্রথম উপজাতি (কা মা আট্রিপেনসিস): বাসস্থান – মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, মহীশূর, তামিলনাড়ু ও কেরালা 2000 মি. উচ্চতার মধ্যে পার্বত্যনালার বাঁশবনে। ইং. সাদার্ন লংটেইলড নাইটজার, তেলেগু— আঙ্কাপ্রিগাড়ু, তামিল – পাড্‌কাই কুরুভি। লম্বায় 28 সেমি। ডাকে 'চউক চলক'। দ্বিতীয় (কা মা ইকুয়াবিলিস): বাসস্থান —শ্রীলঙ্কা 1100 মি. উচ্চতার মধ্যে ঘন জঙ্গলে। ইং. সিলোন লংটেইলড নাইটজার, সিংহলী— চিন বাসসা। লম্বায় 28 সেমি। তৃতীয় (কা মা আমবিগুয়াস): বাসস্থান— দক্ষিণ নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজো, বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল, বার্মা, দক্ষিণ ইউনান থেকে টেনাসেরিয়াম, থাইল্যাণ্ড এবং ইন্দোচীনীয় অঞ্চল। ইং. বার্মিজ লংটেইলড নাইটজার। লম্বায় 33 সেমি। ডাকে 'অরক্‌ অরক্‌…চক-আ-চক'। চতুর্থ (কা মা আন্দামানিকাস): বাসস্থান— মধ্য ও দক্ষিণ আন্দামান। দেখা যায় জঙ্গলের তলায় শুকনো ঝরেপড়া পাতার উপর। লম্বায় 28 সেমি।

পঞ্চম প্রজাতি— ছেপকা (কাপ্রিমালগাসএসিয়াটিকাস)। ইং. ইণ্ডিয়ান লিটল নাইটজার। একটি উপজাতি (কা এ এইডস্‌): বাসস্থান—শ্রীলঙ্কার শুষ্ক ঝোপঝাড়পূর্ণ জঙ্গলে 1000 মি. উচ্চতার মধ্যে। লম্বায় 24 সেমি।

ষষ্ঠ প্রজাতি (কাপ্রিমালগাস আফিনিস)। ইং. ফাঙ্কলিন'স, অ্যালায়েড নাইটজার। বাসস্থান— পাকিস্তান, পাঞ্জাব, হিমালয়ের পাদদেশ ধরে পুবে আসাম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজো, বাংলাদেশ, দক্ষিণে রাজস্থান, কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র থেকে সমগ্র দক্ষিণ ভারত, পশ্চিমবঙ্গ। লম্বায় 25 সেমি। ডানা 132 থেকে 148 মিমি এবং লেজ 95 থেকে 113 মিমি। লম্বায় ছেপকার (24 সেমি) চেয়ে একটু বড়ো হলেও ডানা ও লেজ মাপে ছোটো। এইটুকুনই তফাত। [চলবে]

8/1, ডঃ বীরেশ গুহ স্ট্রীট, কলি-17

অবাক ফাঁদ

বীরেশ ঘটক

এই পেতেছি অবাক ফাঁদ
ঠিক্‌রে পড়া সূর্য চাঁদ
নাম না জানা গ্রহ তারা
না ডাকতেই দিচ্ছে সাড়া
পুঞ্জ পুঞ্জ উল্কাপাত
এদের সাথে মেলায় হাত
সব্‌জে কালো বেগ্‌নি নীল
সূত্র মেনে হচ্ছে মিল
হরেক রকম কাণ্ড হে
রামধনু রঙ পাচ্ছি যে
ডিসেক্‌সনে হচ্ছে লাল
ইলেক্‌ট্রনিক যুক্তিজাল
তোমরা ভাবছ মনের ভ্রম
বৃথাই আমার পণ্ডশ্রম ?
ব্যাপারটা ঠিক জলের মত
যাচ্ছে দেখা মজুত কত
সব ভাঁড়ারের বারুদ বোম
নাও মিলিয়ে সংখ্যা ক্রম
জোরসে এবার লাগাও ঘা
এ্যাটম বোমা ফাটছে না—
বলছ তবে ? আমার কল
হাতে নাতে দিচ্ছে ফল।

প্রশ্নোত্তরে পদার্থবিদ্যা

গ্যাসের ব্যবহার—ক্যাথোড ও অ্যানোড রশ্মি

অলক চক্রবর্তী

নিম্নচাপে গ্যাসের ব্যবহার, ক্যাথোড রশ্মি এবং এক্স রশ্মি নিয়ে তৈরী হল এবারের প্রশ্নোত্তর। এটি একটি ছোট্ট অধ্যায় [মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুযায়ী। স্বভাবতই প্রশ্নোত্তরের সংখ্যা কম।

প্রশ্ন 1 : কোন যন্ত্রের মধ্যে থেকে উৎপন্ন রশ্মি, এক্স রশ্মি না ক্যাথোডরশ্মি কোনো সহজ পরীক্ষার সাহায্যে কি করে বুঝবে ?

উত্তর 1 : উৎপন্ন রশ্মির গতিপথে চুম্বকক্ষেত্রে বা তড়িৎ ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে যদি ওর গতিপথ সরে যায় তবে ঐ রশ্মি ক্যাথোড রশ্মি বা এক্স রশ্মি।

ক্যাথোডরশ্মি ঋণতড়িতাহিত কণিকা নিয়ে গঠিত বলে ওটা চুম্বকক্ষেত্র বা তড়িৎক্ষেত্র দ্বারা সরে যায়, কিন্তু এক্স রশ্মি অনেক ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট তরঙ্গ বলে ওটা সরে যায় না [যেহেতু ওটা কোনরকম তড়িতাহিত কণা নিয়ে তৈরী নয়]।

প্রশ্ন 2 : নিম্নচাপে গ্যাসের মধ্যে তড়িৎমোক্ষণকালে চাপ খুব কম না হলে ক্যাথোডরশ্মি তৈরী হয় না কেন ?

উত্তর 2 : মোক্ষণনলের গ্যাসের মধ্যে আগে কিছু আয়নিত কণা থাকে। তড়িৎদ্বার দুটোর মধ্যে উচ্চ বিভব পার্থক্য থাকায় গ্যাসের চাপ কম হলে ওদের সংঘাতে গ্যাসের অন্যান্য পরমাণুগুলোতে আয়নে পরিণত হয়। এই ভাবে পরা ও অপরা দুরকম তড়িৎধর্মী আয়নই সৃষ্টি হয়। তড়িৎ দ্বার দুটোর মধ্যেকার বিভব পার্থক্য খুব বেশী থাকে বলে ঋণাত্মক আয়ন অ্যানোডের দিকে ও ধনাত্মক আয়ন ক্যাথোডের দিকে ছুটে যায়। ধণাত্মক আয়ন ক্যাথোড পাতে আঘাত করলে ওর থেকে কিছু ইলেকট্রন বের হয়, সেগুলো আবার ধনতড়িৎ দ্বারের (অ্যানোড) দিকে যাবার সময় গ্যাসীয় পরমাণুগুলোর সঙ্গে ধাক্কা খায়। কিন্তু চাপ খুব কম থাকলে (প্রায় 10 মি. মি.) ঐ ইলেকট্রনগুলো ধাক্কা ছাড়াই অ্যানোডের দিকে ছুটে যায় ও সেই দিকের কাঁচের দেয়ালে আঘাত করে ক্যাথোডরশ্মি তৈরী করে।

প্রশ্ন 3 : কি করে প্রমাণ করা যায় যে এক্সরশ্মি কোনরকম আধানে আহিত কণিকা দিয়ে তৈরী নয় ?

উত্তর 3 : এক্স-রশ্মির গতিপথ তড়িৎক্ষেত্র বা চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুত হয় না বলে বোঝা যায় যে ওটা ক্যাথোডরশ্মির মতো ঋণাত্মক তড়িতাহিত কণা দিয়ে তৈরী নয়। প্রকৃতপক্ষে, ওটা খুব ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একরকমের তরঙ্গ (এটা পরীক্ষা করে জানা গেছে)।

প্রশ্ন 4 : ক্যাথোড রশ্মি কোন্‌প্রকার আধানে আহিত কণা নিয়ে তৈরী ? এটা কেমন ভাবে প্রমাণ করা যায় ?

উত্তর 4 : ক্যাথোড রশ্মি ঋণাত্মক তড়িতাধানে আহিত কণা দিয়ে তৈরী।

যদি ক্যাথোড রশ্মি সত্যিই ঋণাত্মক তড়িতাধানে আহিত কণা দিয়ে তৈরী হয় তবে ওর গতির জন্যে যে তড়িৎপ্রবাহ তৈরী হবে তার দিক অ্যানোড থেকে ক্যাথোডের দিকে হবে। এখন কোনো শক্তিশালী চুম্বকের উত্তরমেরু ক্যাথোড রশ্মির গতির সমকোণে রাখলে ক্যাথোড-রশ্মি দ্বারা অ্যানোডের কাছাকাছি কাঁচের দেয়ালে যে উজ্জ্বল প্রতিপ্রভা তৈরী হয় তা নীচের দিকে সরে যাবে; অর্থাৎ চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা ক্যাথোড রশ্মি সৃষ্ট তড়িৎপ্রবাহ বিক্ষিপ্ত হবে (দিক জানা যায় ফ্লেমিং-র বামহাত নিয়ম থেকে)। সুতরাং প্রমাণিত হয়, ক্যাথোডরশ্মি ঋণাত্মক তড়িতাধানে আহিত কণা (ইলেকট্রন) দিয়ে তৈরী।

প্রশ্ন 5 : এক্স-রশ্মির ভেদন-ক্ষমতা কি করে পালটানো যায় ?

উত্তর 5 : এক্স-রশ্মি তৈরী যন্ত্রের ক্যাথোড ও অ্যানোডের মধ্যে বিভবপার্থক্য বেশী (বা কম) করলে আগে তৈরী ক্যাথোড-রশ্মির ঋণাত্মক তড়িৎকণার বেগ বেশী (বা কম) হবে। এই বেশী (বা কম) বেগের তড়িৎকণাগুলো সামনের টাংস্টেন লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করে যে এক্স-রশ্মি তৈরী হবে তার পদার্থ ভেদ করার ক্ষমতাও বেশী (বা কম) হবে। এক্সরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত কম হয়, ওর ভেদন-ক্ষমতাও তত বেশী হয়। প্রসঙ্গত· উল্লেখযোগ্য যে পদার্থ ভেদ করার বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন রশ্মিকে কঠিন এক্স-রশ্মি ও কম ক্ষমতাসম্পন্ন রশ্মিকে কোমল এক্স-রশ্মি বলে।

জয়পুরিয়া কলেজ, কলিকাতা

কৃতী বিজ্ঞানী শান্তিরঞ্জন পালিত

বিবেক রায়

আদি নিবাস বাংলা দেশের বরিশাল জেলার গাবধান গ্রাম। শান্তিরঞ্জনের ঠাকুর্দা দুর্গাগতি পালিত পুরুষানুক্রমে সেখানে বাস করতেন। শান্তিরঞ্জনের পিতার নাম ছিল নরনারায়ণ পালিত এবং মায়ের নাম ছিল কুসুম কুমারী দেবী।

শান্তিরঞ্জনের জন্ম হয় কলকাতায় 207 নম্বর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের একটি বাড়িতে। জন্মের পর মায়ের অসুস্থতার জন্যে চিকিৎসক শান্তিরঞ্জনকে মায়ের দুধ খাওয়াতে নিষেধ করেছিলেন। শিশু শান্তিরঞ্জনকে মাতৃ দুগ্ধের বদলে খাওয়ানো হতো গাধার দুধ। পরবর্তী জীবনে কৃতী বিজ্ঞানী হয়ে শান্তিরঞ্জন এই ঘটনাটি উল্লেখ করে তাঁর নাতি-নাতনীদের প্রায়ই সহাস্যে বলতেন, 'তোমরাও দেখে রাখ, গাধার দুধ খেয়েছি বলেই মাথায় এতো বুদ্ধি গজিয়েছে!'

ক্যালক্যাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে শান্তিরঞ্জন বিদ্যাশিক্ষা শুরু করেন। 1927 সালে ঐ স্কুল থেকে চারটি বিষয়ে লেটার, একটিতে স্টার ও ডিস্টিংশন পেয়ে তিনি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন।

বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে আই. এস. সি. পাশ করে শান্তিরঞ্জন রসায়নে অনার্স পড়ার জন্যে বি. এস. সি. ক্লাশে ভর্তি হন। বি. এস. সি. (রসায়ন অনার্স) পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস. সি. পাশ করেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

এম. এস. সি. পাশের দু' বছর পরে কলকাতায় বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অধীনে বিশুদ্ধ রসায়ন বিভাগের ল্যাবরেটরীতে তিনি গবেষণা করতে যান। এখানে কিন্তু তাঁর গবেষণায় মন বসে নি। তাই বছর খানেক পর গবেষণা ছেড়ে বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার কাজ শান্তিরঞ্জন শুরু করেন আরও দু' বছর পরে 1938 সালে। তখন তিনি রাঁচীর লাক্ষা গবেষণা কেন্দ্রে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যাণ্টরূপে সেখানকার ডিরেক্টার ডক্টর এইচ. কে. সেনের অধীনে কাজে যোগ দেন। ডক্টর সেন শান্তিরঞ্জনকে গবেষণার কাজে পূর্ণ স্বাধীনতা দেন। শুরু হয় তরুণ বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানের পথে জয়যাত্রা। লাক্ষা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন তিনি। এখানে co-solvancy বা সহাদ্রাব্যতা বিষয়ক তাঁর প্রথম সবেষণা পত্রটি বিজ্ঞানীদের প্রশংসা ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লাক্ষা সংক্রান্ত গবেষণায় কৃতিত্বের জন্যে শান্তিরঞ্জন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ও ডি. এস. সি. ডিগ্রী লাভ করেন।

1943 সালে পিতৃ বিয়োগের পর শান্তিরঞ্জন রাঁচীর লাক্ষা গবেষণা কেন্দ্রের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ বেকার অবস্থায় কলকাতায় ফিরে আসেন। কলকাতায় এসে তিনি যখন চাকরির চেষ্টা করছিলেন তখন ক্যালিফোর্ণিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাকবেন তাঁকে আমন্ত্রণ জানান—তাঁর অধীনে থেকে গবেষণা করার জন্যে। 1945 সালে শান্তিরঞ্জন অধ্যাপক ম্যাকবেনের ল্যাবরেটরীতে গবেষক হিসাবে যোগদান করেন। এখানে উপযুক্ত পরিবেশে ও সকল রকম সুযোগ সুবিধা পাওয়ায় মাত্র এক বছরের মধ্যে শান্তিরঞ্জন এগারোটি গবেষণাপত্র রচনা করেন।

1946 সালে শান্তিরঞ্জন ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে চলে আসেন নিউইয়র্কে।

1947 সালে দেশে ফিরে এসে শান্তিরঞ্জন নিজেকে বিজ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত করেন।

অধ্যাপক পালিতের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিল নিয়মানুবর্তিতা। প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে তিনি দু' ঘণ্টা পড়াশুনা করতেন। তারপর জল খাবার খেয়ে নিয়ে সকাল ঠিক আটটায় হাজির হতেন যাদবপুরে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোয়সিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্সের কার্যালয়ে তাঁর নিজের ঘরে। সেখানে ডুবে থাকতেন নিজের কাজে।

অধ্যাপক পালিত নিজে ছিলেন বিজ্ঞান সাধক। অনেক বিজ্ঞানীও তিনি তৈরি করে গেছেন নিজের হাতে। নব্বই জন ছাত্র তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছেন। এও অধ্যাপক পালিতের জীবনের এক বিরাট কৃতিত্ব।

এন. বি. টি-99A, নিউট্রাফিক, খড়্গপুর।

কেমন করে কাজ করে

লিফ্‌ট বা এলিভেটর

লিফট মানে উঁচুতলার বাড়িতে যে খাঁচাটি মানুষজন বয়ে নিয়ে ওঠা-নামা করে। তোমরা সকলেই বোধহয় জিনিসটা দেখেছো, লিফটে চড়েছোও অনেকেই। এর 'এলিভেটর' নামটা চালু হয় আমেরিকা থেকে। প্রথম নিরাপদ এলিভেটর আবিষ্কার করেন আমেরিকার ইলিশা গ্রেভস ওটিস, 1852 সালে। 1854 সালে নিউইয়র্ক শহরে ওটিস তাঁর তৈরি এলিভেটর চালিয়ে দেখিয়েছিলেন সবাইকে। নিজে এলিভেটরে চড়ে উঠে গেলেন অনেক উঁচুতে; তারপর এলিভেটরের ধাতব দড়িটা কেটে দিতে আদেশ দেন সহকারীদের। দড়ি কেটে দেওয়ার পর এলিভেটরটি খুব ধীরে ধীরে নিরাপদে নেমে আসে নিচে। প্রমাণিত হয়, এলিভেটর মোটেই বিপজ্জনক নয়। তখন থেকেই চল হতে শুরু করে এই নতুন যন্ত্রটির।

এলিভেটর চালু হওয়ার আগে মানুষ পাঁচ-ছ' তলার চেয়ে উঁচু বাড়ি তৈরি করতো না। অবশ্য কয়লা বা অন্যান্য মালপত্র কপিকল দিয়ে টেনে তোলার ব্যবস্থা ছিলো খনি ও কারখানায়। প্রথম দিকে তৈরি এলিভেটরগুলো চলতো বাষ্পীয় ইঞ্জিনে। তারপর এলো জল চালিত এলিভেটর। অবশেষে, 1890 সালে, যখন বিদ্যুৎশক্তি আমেরিকার নানা জায়গায় ছড়িয়ে গেলো, তখন চালু হলো বৈদ্যুতিক এলিভেটর। আমেরিকায় এখন শতকরা সাতানব্বই ভাগ এলিভেটরই বৈদ্যুতিক।

এখন প্রশ্ন হলো, কেমন করে কাজ করে বৈদ্যুতিক এলিভেটর বা লিফট।

তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো, লিফট ওপরে উঠে গেলে কালো রঙের একটা ওজনদার জিনিস নেমে আসে নিচে। তার সঙ্গে লাগানো থাকে ধাতব দড়ি। আর যেখানে ওজনটা নেমে আসে সেখানে থাকে একটা মজবুত স্প্রীং, যাতে ওজনটা মেঝের সঙ্গে জোরালো ধাক্কা না খায়। এই ওজনটাকে পরিভাষায় বলা হয় 'কাউন্টারওয়েট'। কাউন্টারওয়েটের রহস্য ব্যাখ্যা করতে একটা সহজ উদাহরণ দেওয়া যাক।

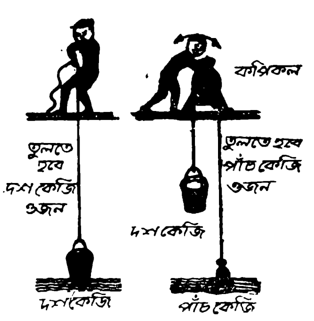
কপিকল
তুলতে হবে দশ কেজি ওজন
তুলতে হবে পাঁচ কেজি ওজন
দশ কেজি
দশ কেজি
পাঁচ কেজি

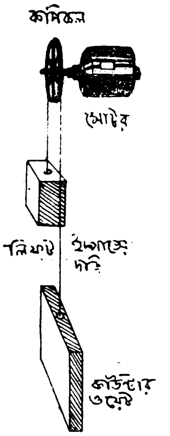

মনে করো, একটি লোক কুয়ো থেকে বালতি করে জল তুলছে। জল সমেত বালতির ওজন ধরা যাক দশ কিলোগ্রাম। এই দশ কিলোগ্রাম ওজন তুলতে লোকটিকে কিছু শক্তি খরচ করতে হবে। এখন সে মনে মনে একটা মতলব ভাঁজলো। দড়ির এক প্রান্তে বালতি বাঁধা রয়েছে। সে করলো কি অন্য প্রান্তে পাঁচ কিলোগ্রাম ওজনের একটা লোহার খণ্ড বেঁধে দিলো। তারপর দড়িটা ঝুলিয়ে দিলো একটা কপিকলের ওপর দিয়ে। এবার যদি সে কপিকলের হাতল ঘুরিয়ে জল ভর্তি বালতিটা টেনে ওপরে তোলে তাহলে আগের চেয়ে অনেক কম শক্তি তাকে খরচ করতে হবে। সুতরাং ঐ পাঁচ কিলোগ্রামের লোহাটুকুই হলো জলভর্তি বালতির 'কাউন্টারওয়েট'। কাউন্টারওয়েটের জন্যই লোকটিকে জল তুলতে কম পরিশ্রম করতে হবে। তার মনে হবে, সে মাত্র পাঁচ কিলোগ্রাম ওজন তুলছে অর্থাৎ, জলভর্তি বালতির ওজন ও কাউন্টারওয়েটের বিয়োগ ফল। যদি কাউন্টারওয়েটের ওজন হয় আট কিলো, তাহলে লোকটিকে টেনে তুলতে হবে মাত্র দু' কেজি ওজন।

লিফটের বেলায় জলভর্তি বালতিটা হচ্ছে মানুষ ভর্তি খাঁচা, আর কপিকলটি ঘোরানো হয় বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে। মোটর কপিকল ঘুরিয়ে যে ওজনটুকু টেনে তোলে সেটা মানুষভর্তি খাঁচা আর কাউন্টারওয়েটের ওজনের বিয়োগফল। লিফটে লোক কম বা বেশি উঠলে এই বিয়োগফলের সামান্য হেরফের হয়।

চলন্ত লিফ্‌টকে তড়িৎচুম্বকের সাহায্যে ব্রেক কষে

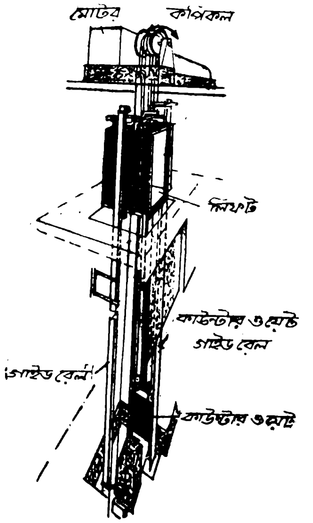

থামানোর ব্যবস্থা থাকে। এছাড়া নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো, কোন তলায় এসে থামার আগে লিফ্‌ট-এর গতি বেশ কমে যায়। এটা করা হয় মোটরের গতি কমিয়ে। মোটরকে দ্রুত গতি থেকে কম গতিতে নিয়ে যাওয়া যায় অটোমেটিক সুইচ দিয়ে। আবার লিফ্‌ট-এর দরজা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খোলা-বন্ধ করার জন্যেও থাকে একই ধরণের অটোমেটিক সুইচ। লিফ্‌ট যখন বাড়ির কোন তলায় এসে থামে তখন এই স্বয়ংক্রিয় সুইচের কাণ্ডকারখানাতেই দরজা খুলে যায়, আবার বন্ধও হয়।

লিফ্‌ট ওপরে-নিচে ওঠানামার সময়ে যাতে পাশে নড়াচড়া না করতে পারে তার জন্য খাঁচার দুপাশে দুটো খাড়া লোহার রেল থাকে—ঠিক রেল লাইনের মতো। এই রেল লাইন দুটো লিফ্‌ট-এর খাঁচার গায়ে খাঁজে বসে থাকে। ফলে খাঁচাটির রেল লাইন বরাবর ওঠানামা করা ছাড়া পথ থাকে না। এই রেল লাইন দুটিকে বলা হয় 'গাইড রেল'। কাউন্টারওয়েটের জন্যেও একইরকম 'গাইড রেল' থাকে।

এবারে আসা যাক দুর্ঘটনার কথায়। হঠাৎ করে যদি লোডশেডিং হয় বা লিফ্‌ট টেনে তোলার ইস্পাতের দড়িটা পট্‌ করে ছিঁড়ে যায়, তাহলে! না, লিফ্‌ট-এর যাত্রীদের কোন বিপদ হবে না তাতে। বিপদ এড়াবার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে আধুনিক লিফটে। ঠিক যেমনটি ছিলো ওটিস সাহেবের এলিভেটরে। কোন দুর্ঘটনার ফলে খাঁচা গড়গড় করে নামতে শুরু করলেই একটা নিরাপত্তা সুইচ 'অন' হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ইস্পাতের দু-পাটি শক্তিশালী দাঁত গাইড রেল দুটোকে সজোরে আঁকড়ে ধরে। ফলে রেল বেয়ে খাঁচাটি আর নিচে নামতে পারে না। আধুনিক লিফ্‌টে আরো সব নতুন ধরণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে। যেমন, দরজা ঠিক মতো বন্ধ না হলে লিফ্‌ট চালু হবে না; যে কোন তলায় ঠিক মতো এসে না দাঁড়ালে লিফ্‌টের দরজা খোলা যাবে না; এরকম আরো কতো! এছাড়া লোডশেডিং হলে বা মোটর বিকল হলে কপিকলকে হাতে করে ঘোরানোরও ব্যবস্থা থাকে। তাতে লিফ্‌টকে খুশি মতো কোন তলায় এনে দাঁড় করিয়ে যাত্রীদের নিরাপদে বের করে নেওয়া যায়।

অনীশ দেব

পরের সংখ্যায়ঃ প্যারাসুট

বুদ্ধি নিয়ে খেলার উত্তরঃ

বহুভুজের কর্ণ

(1) 35 (2) 1175 (3) $\frac{x(x-3)}{2}$

লোভী সেনাপতির গল্প

16 দিনের দিন; 14 দিনের দিন।

জ্বলন্ত মোমবাতির মজা

তিন ঘণ্টা।

কবির ফুলবাগান

ছবি দেখ—

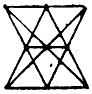

ম্যাজিক ত্রিভুজ

উত্তরের ছবি দেখ।

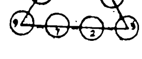

বুদ্ধি নিয়ে খেলা

পার্থসারথি চক্রবর্তী

বহুভুজের কর্ণ

তোমরা সবাই ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বহুভুজ—এই সবের কথা জান। চতুর্ভুজে মোট কর্ণ (diagonal) টানা যায় মাত্র দুটো, পাঁচ বাহু বিশিষ্ট বহুভুজে ওটা টানা যায় মোট পাঁচটা (ছবি দেখ)। তোমরা বুদ্ধি খাটিয়ে বলতো—(1) দশটা বাহু আছে এমন বহুভুজে মোট কটা কর্ণ (diagonal) আছে? (2) পঞ্চাশটা বাহু আছে এমন বহুভুজে মোট কটা কর্ণ (diagonal) আছে? (3) বহুভুজের কর্ণ বের করার কোনও সাধারণ সূত্র আছে কি?

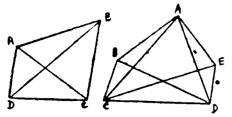

লোভী সেনাপতির গল্প

কোনও এক দেশের সেনাপতি যুদ্ধে জয়লাভ করে এসে রাজাকে বললেন—"আমি বীরের মতো যুদ্ধ করে আপনার জন্য রাজ্য জয় করেছি। আমাকে এক কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে পুরস্কৃত করুন।"

রাজা ভেবেই রেখেছিলেন যে সেনাপতি যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে তাঁকে যথোপযুক্ত সম্মান দিয়ে পুরস্কার দেবেন। কিন্তু সেনাপতির কথায় তিনি মনে মনে দারুণ চটলেন। রাজা মনে মনে এক মতলব আঁটলেন। তিনি সেনাপতিকে বললেন—শুধু এককোটি স্বর্ণমুদ্রা নয়, তার চেয়েও বেশী অর্থ দিতে প্রস্তুত তবে একটি সর্তে। সর্তটি হলো—সেনাপতি প্রতিদিনই কিছু স্বর্ণমুদ্রা নিতে পারবেন। যেমন প্রথম দিন সেনাপতি একটি স্বর্ণ মুদ্রা নিলেন। ঐ মুদ্রার ওজন পাঁচ গ্রাম। পরের দিন তিনি প্রথম দিনের দ্বিগুণ মুদ্রা, তৃতীয় দিনে আবার দ্বিতীয় দিনের—দ্বিগুণ—এই ভাবে স্বর্ণমুদ্রা নিতে পারবেন। কিন্তু প্রতিদিনই ঐ স্বর্ণমুদ্রা সেনাপতিকে নিজেই বহন করে নিয়ে যেতে হবে, তিনি অন্য কোনও লোকের সাহায্য নিতে পারবেন না। যদি কোনও দিন তিনি ঐ স্বর্ণমুদ্রা বয়ে নিতে না পারেন তাহলে তাকে সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা (প্রথম দিন থেকে যত নিয়েছেন) ফেরত দিতে হবে।

সেনাপতি রাজার কথায় রাজী হলেন এবং সেইদিনই রাজকোষ থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ী গেলেন। সেনাপতির গিন্নিও ঐ স্বর্ণমুদ্রা দেখে একেবারে আহ্লাদে আটখানা! কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস ঐ সেনাপতি একদিন মোট স্বর্ণ-মুদ্রার থলি বয়ে নিতে আর পারলেন না। প্রথম দিন সেনাপতি একটি মুদ্রা নিয়েছিলেন যার ওজন ছিল 5গ্রাম; দ্বিতীয়দিন তিনি 2টি স্বর্ণমুদ্রা নিয়েছিলেন যার ওজন 10 গ্রাম; তৃতীয় দিন তিনি 4টি স্বর্ণ মুদ্রা নিয়েছিলেন যার ওজন ছিল 20 গ্রাম; চতুর্থ দিন তিনি 8টি স্বর্ণমুদ্রা নিয়েছিলেন যার ওজন ছিল চল্লিশ গ্রাম এই রকম আর কি। তোমরা এবার মাথা খাটিয়ে বলতো (1) কোন দিন ঐ সেনাপতি স্বর্ণমুদ্রার থলি বাড়ী আনতে পারেন নি—যদি তাঁর এক কুইণ্টলের বেশী ভার বহন করবার সামর্থ্য না থাকে? খুব ভেবেচিন্তে মাথা খাটিয়ে উত্তর দিতে হবে কিন্তু। (2) যদি প্রতিটি স্বর্ণমুদ্রার ওজন 20 গ্রাম হতো তাহলে ঐ সেনাপতি কতদিন পরে স্বর্ণথলির ভার আর বইতে পারতেন না?

কবির ফুল বাগান

একজন কবির এক মস্ত ফুল বাগান ছিল। তিনি কায়দা করে তাতে নানা ধরনের ফুলগাছ লাগাতেন। কখনও গোল করে ঘিরে ফুলগাছ লাগাতেন—কখনও বা আবার সুন্দরভাবে সারি সারি করে সাজিয়ে। সবাই কবির চমৎকার সাজানো বাগান দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত। একবার তিনি ছটা ফুলগাছকে চারটে সারিতে ছবিতে যেমন করে দেখানো হয়েছে সেই ভাবে সাজালেন। এটা সাজানোর পর তাঁর মাথায় ঢুকল ন'টা ফুলগাছকে কেমন করে সারি দিয়ে লাগানো যায় যাতে যেদিক থেকেই (অর্থাৎ কোনাকুনি, সোজাসুজি) লাইন টানা যাক না কেন—মোট নটা লাইন হবে এবং প্রতিটি লাইনেই তিনটে করে গাছ থাকবে। তোমরা পার কিনা একবার বুদ্ধি খাটিয়ে দেখ।

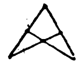

ম্যাজিক ত্রিভুজ

কিভাবে তুমি 1 থেকে 9 সংখ্যা ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুতে বসাবে দেখাও—যেন প্রত্যেক বাহুর সংখ্যাগুলির যোগফল 21 হয়। ত্রিভুজের এক কোনে 3 সংখ্যাকে ইংরাজীতে লিখে রাখা হয়েছে। মনে রাখবে কোনও একটি সংখ্যাকে দু'বার লেখা চলবে না।

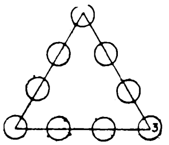

জ্বলন্ত মোমবাতির মজা

একটা ছোট ছেলে একই উচ্চতার দুটো মোমবাতি কিনে এনেছিল। ওদের একটা 6 ঘণ্টা ধরে জ্বলতে পারে আর একটা পারে মাত্র 4 ঘণ্টা। ছোট ছেলেটি দুটো মোমবাতিই একসঙ্গে জ্বালিয়ে দিল। তুমি এবার মাথা খাটিয়ে বলতো কতক্ষণ পরে একটা মোমবাতির উচ্চতা আর একটার চাইতে দ্বিগুণ হবে?

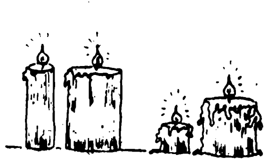

DENDRITE

A range of adhesives
to meet the many needs
of industry

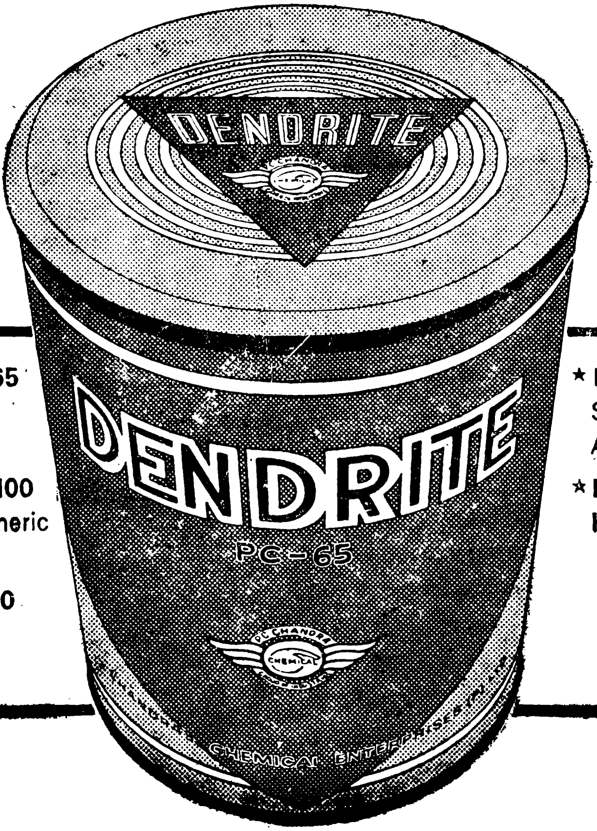
DENDRITE
DENDRITE
PC-65
CHEMICAL ENTERPRISES

- ★ **DENDRITE PC-65**
  Synthetic Rubber Adhesive
- ★ **DENDRITE OR-100**
  Synthetic Elastomeric Adhesive
- ★ **DENDRITE SR-60**
  Synthetic Rubber Adhesive
- ★ **DENDRITE PC-182**
  Synthetic Rubber Adhesive
- ★ **DENDRITE HM**
  Hot Melt Adhesives

P.C. CHANDRA
CHEMICAL
GROUP

Chandras' Chemical Enterprises (P) Ltd., Calcutta.

CCO/CAS-3/82

স্বাস্থ্য রক্ষায় সঙ্গীত

জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বাস কর, আর নাই কর, মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় সঙ্গীত এক পরম সহায়ক, বিশেষ করে ফুসফুস ও শ্বাসনালীর সুস্থতা বজায় রাখতে। যাঁরা গান বাজনাকে বাজে সময় নষ্ট করা বলে অবজ্ঞার চোখে দেখেন তাঁরা জেনে রাখুন, এই মত সর্বাধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের। শুধু তাই নয়, শুনলে আরো অবাক হবে, যেটাকে এ যাবৎ আমরা নিছক ছেলেমানুষি চপলতা বা অশিষ্টতা রূপে ভাবতে অভ্যস্ত সেই শিস দেওয়া ও তার সঙ্গে গুন গুন করে সুর ভাজার গলা ছেড়ে গান গাওয়া তথা নিয়মিত গলা সাধা ও সঙ্গীতি চর্চা হাঁপানি রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। কারণ, এতে করে ফুসফুসে যে চাপ সৃষ্টি হয় তা উপযুক্ত শ্বসন ক্রিয়ার ও হাঁপানি নিবারণের সহায়ক। আবৃত্তি ও বক্তৃতা অভ্যাসও একই উদ্দেশ্যের সহায়ক।

এই রোগ যে যে কারণে হয় তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে জীবানুহীন 'অ্যালার্জি' অর্থাৎ অতি সংবেদক অবস্থা সৃষ্টির উপাদান ও হেতু সমূহ।

সাধারণত খাদ্য দ্রব্য, ঔষধ, নানা ধরণের ধূলোবালি, পশুলোম এমন কি আবহাওয়ার উপাদান প্রভৃতিও এর কারণ হতে পারে। যে আবহদূষণ বা 'ইকোলজিকাল পলিউশন' নিয়ে সঙ্গত কারণেই ইদানিং সারা পৃথিবী জুড়ে হৈ চৈ চলছে, তাতেও অবশ্য এই অতি সংবেদক অবস্থার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। রোগ জীবানু ও তার বিপাক জনিত কারণেও অনেক সময় লোকে জীবানুহীন পদার্থ সম্পর্কে অতি সংবেদক হয়ে ওঠে। আর এ জন্যও হাঁপানির আক্রমণ ঘটা সম্ভব। সম্প্রতি 'পার্থেনিয়াম' নামে বিদেশ থেকে দৈবাৎ আসা বিষাক্ত আগাছা ও অ্যালার্জিক একজিমাও হাঁপানির জন্য দায়ী।

আধুনিক ওষুধে অবশ্য হাঁপানি সারিয়ে তোলা বা তার উপশম করা সম্ভব। কিন্তু রোগ নিবারক ব্যবস্থাবলীর গুরুত্ব এতে অত্যাধিক। মেজাজ বিগড়োনো, রোজকার কার্যসূচী বা খাবারের হঠাৎ আকস্মিক পরিবর্তনের জন্য যেক্ষেত্রে হাঁপানির সূত্রপাত হয় তা রোগনিবারক পদ্ধতিতে সম্পূণ নিবারিত বা বন্ধ সম্ভব। বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা খুবই ফলপ্রসু।

চিকিৎসকগণ হাঁপানির আক্রমণকে সময় অনুসারে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেন। প্রথমত সংকেত পর্যায় বা 'ওয়ার্নিং সিগন্যাল স্টেজ' যা সত্যিকারের অর্থাৎ আসল আক্রমণের কয়েক ঘণ্টা আগে দেখা দেয়। বয়স্কদের ক্ষেত্রে এই লক্ষণগুলি ধরা সহজ। কারণ এগুলির সঙ্গে রোগী পরিচিত হয়ে পড়ে আর তা রোগী বিশেষের স্থায়ী ও বিশিষ্ট রোগ লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেকের ক্ষেত্রে হঠাৎ করে সর্দি দেখা দেয়, নাক বন্ধ ও তা ভরাট হয়ে আছে, এমনটি বোধ হতে থাকে। এবং ঘন ঘন হাঁচি পড়ে, ইত্যাদি। তারপরই ক্রমে শুরু হয়ে যায় নিঃশ্বাস নিতে না পারার কষ্ট, টান।

বাচ্চাদের বেলায় এই লক্ষণটি ধরার দায়িত্ব তাদের মায়েদের। শিশুর শ্বাস প্রশ্বাসে ফোঁস ফোঁস শব্দ শোনা যায় এই অবস্থায়। তার স্বভাব খিটখিটে হয়ে যায়। সে বিরক্ত বোধ করতে থাকে। সহজেই কাঁদে কিংবা একদম কাঁদে না। নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় তার গায়ের চামড়ার চুলকানি দেখা দিতে পারে এবং তার মুখ ও ঠোঁট ফুলে উঠতে পারে।

এ সব লক্ষণ দেখা দেওয়া মাত্রই ডাক্তারের ব্যবস্থা অনুযায়ী রোগ নিবারক ওষুধ পত্র খাওয়া উচিৎ। এ জন্য ব্যবহার্য কয়েকটি ওষুধের নাম : থিয়োফাইলিন, এফিড্রিন, ইউস্পিরিণ ও আইসোড্রিন। যাদের জন্য এসব ওষুধের ব্যবস্থা করা হয়, তাদের মনে রাখা দরকার যে শুধু মাঝে মধ্যে নয়, এগুলি অনেকক্ষণ, কিংবা অনেক বছর ধরে নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করতে হয়। অবশ্য চিকিৎসকের মতে।

এই ব্যাধির অবশ্য অনুরূপ অন্যান্য ব্যাধিরও প্রতিকার কল্পে প্রতিষেধক হিসেবে প্রয়োজন শান্ত নিরুদ্রব পরিবেশ বসবাস, প্রত্যহ সমুদ্রজলের সমান লবনাক্ত—অর্থাৎ এক বালতি জলে চা চামচের দেড় কিম্বা দু' চামচ লবণ মেশানো গরম জলে স্নান এবং গরম জলে পাঁচ-সাত মিনিট পা ডুবিয়ে রাখা অর্থাৎ ফুটবাথ নেওয়া। এ সবই হাঁপানি রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। রোগ পুরোপুরি দেখা না দেওয়া অবধি অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার একান্ত অনুচিত।

পরিশেষে, শ্বাসনালির হাঁপানির ব্যাপক প্রকোপ ও প্রসার কমাতে, আমাদের দেশের আবহ সংরক্ষণ ও জন স্বাস্থ্য বিধান ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিৎ যা অ্যালার্জি উৎপাদন উপাদান কমানোর সহায়ক।

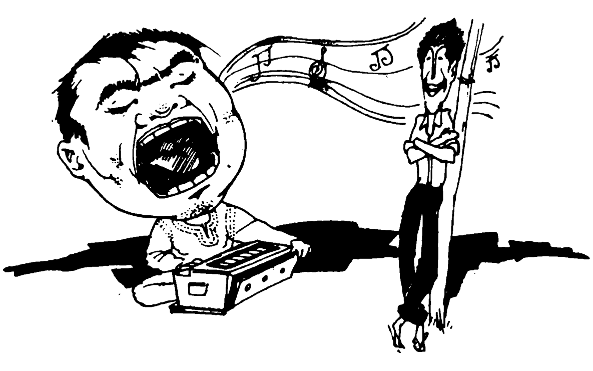

বিচিত্র সংবাদ

* পৃথিবীতে প্রায় দশ লক্ষ জাতের প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে। তার মধ্যে প্রায় 4 লক্ষ জাতের পোকামাকড় আছে। উভয়চর 3 হাজার, সরীসৃপ—6 হাজার, পাখি-9 হাজার ও স্তন্যপায়ী 3 হাজার জাতের। প্রায় একশ ফুট লম্বা ও কয়েক হাজার কিলোগ্রাম ওজনের প্রাণীও আছে। এছাড়াও অনেক নতুন নতুন জাতের প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

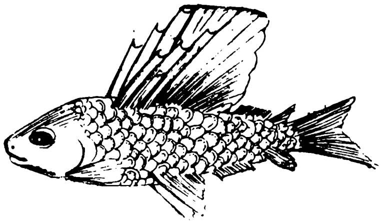

* সমুদ্রে একপ্রকার মাছ আছে, যে মাছ উড়তে পারে। তাকে উড়ুক্কু মাছ বলে। কোন কোনটা প্রায় এক হাজার গজ উড়ে যেতে পারে।

* 'ইলেকট্রিক ঈল' নামক একপ্রকার সাপের মতো আকৃতির মাছ আছে, এরা সমুদ্রের গভীরে থাকে! এইমাছ ইলেকট্রিক শক্ দেয়।

জয়শ্রী দত্ত

হলদিবাড়ী, জেলা—কুচবিহার।

* সম্প্রতি জানা গেছে বিশ্বের সব থেকে ছোট গ্রন্থের নাম হল "আওয়ার ফাদার"। জাপান থেকে প্রকাশিত এই বইটির আয়তন—"মাত্র 1·4 মিলিমিটার"। এই আয়তনের জন্য এটা একটি বিশ্ব রেকর্ডও করেছে—সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম গ্রন্থ বলে। এই গ্রন্থটির অধিকারী যুগোশ্লাভিয়ার ডঃ মার্টিনের একমাত্র সখ সবচেয়ে ক্ষুদ্রায়তনের বই সংগ্রহ করা। তার কাছে এখন পর্যন্ত প্রায় 800টি এইরকম গ্রন্থ রয়েছে। সেগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে রচিত।

* মৌমাছি আমরা সবাই দেখেছি, মৌমাছি যদি আমাদের কাছ দিয়ে উড়ে যায়, তবে একটা গুণগুণ শব্দ শুনতে পাই। কিন্তু মৌমাছির গুণগুণ শব্দ কোন আলাদা শব্দ নয়—দ্রুত ডানা নাড়ানোর ফলেই এই শব্দের সৃষ্টি হয়। ভাবতেও অবাক লাগে যে কত দ্রুত ডানা তারা নাড়ায় – মিনিটে 24000 অর্থাৎ সেকেণ্ডে 400রও বেশী বার। ভাবো তো কত ছোট প্রাণী অথচ কত জোরে সে ডানা নাড়াচ্ছে। এটা কম আশ্চর্যের কথা নয়।

* গুজরাটে অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ ডাইনোসারাসের চারটি ডিম পাওয়া গেছে। অতিকায় এই সরীসৃপ কুড়ি কোটি বছর আগে জন্ম নেয়। জীবাশ্ম আকারে পাওয়া এই চারটি ডিমই প্রমাণ করল যে অন্তত ছয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে এই ভূখণ্ডে ছিল ডাইনোসোরাসের অস্তিত্ব। ভূপৃষ্ঠে এরা স্থায়ী ছিল চোদ্দ কোটি বছর। বর্তমানে এগুলো রাঁচীর বিজ্ঞান কংগ্রেসে প্রদর্শিত হয়েছে।

* ক্যানসার মুক্তি পাবার জন্য আমরা হাসপাতালে কত কিনা করি। কানাডায় এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, "বেটা—ক্যারোটিন" নামে এমন একটি পদার্থ "গাজর ফুলকপি, বাঁধাকপির মধ্যে আছে যা অধিক পরিমাণে ভিটামিনের সঙ্গে মিলিত হবার পর নষ্ট হয়ে যাওয়া কোষ গুলোকে শতকরা 40 ভাগ বাদ দিয়ে দেয়—ক্যান্সার নিরাময়ের ক্ষেত্রে যা অনেক সহায়ক।

* বিজ্ঞানের জন্ম এই ভারতভূমিতেই। ফিনল্যাণ্ডের প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ এরকা মাউলা এক বিস্তৃত গবেষণার পর জানিয়েছেন যে 2500 খ্রীষ্ট পূর্বে মহেঞ্জোদাড়োর লোকেরা বর্ষা কখন শুরু হবে বা কখন সিন্ধুনদে বন্যা আসবে, জানার জন্য পাথরের বর্ষ লিপি ব্যবহার করত। ওটাই হল প্রথম বৈজ্ঞানিক যন্ত্র।

অভিজিৎ মিত্র

সুভাষ ভবন, রায়নগর, বাঁশদ্রোণী, 24 পরগণা।

সালোক সংশ্লেষ

দিনোজকুমার দে

১। **প্রশ্ন ঃ** সালোকসংশ্লেষ কাকে বলে ?

উত্তর ঃ যে জটিল জৈবনিক প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদেরা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলের সহায়তায় মাটি হইতে শোষিত জল এবং পরিবেশ হইতে গৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইডের সাহায্যে শর্করা জাতীয় (কার্বোহাইড্রেট) খাদ্য প্রস্তুত করে এবং গৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইডের সমপরিমাণ অক্সিজেন গ্যাস করে, তাহাকেই সালোকসংশ্লেষ বলে।

২। **প্রশ্ন ঃ** সালোকসংশ্লেষ কখন হয় ?

উত্তর ঃ সালোকসংশ্লেষ কেবলমাত্র দিনের বেলায় হয়।

৩। **প্রশ্ন ঃ** সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কি কি উপাদান প্রয়োজন ?

উত্তর ঃ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড, ক্লোরোফিল ও সূর্যালোকের প্রয়োজন।

৪। **প্রশ্ন ঃ** সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কাঁচা উপকরণ দুইটি কি কি ?

উত্তর ঃ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কাঁচা উপকরণ দুইটি যথাক্রমে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল।

৫। **প্রশ্ন ঃ** সালোকসংশ্লেষের ফলে যে অক্সিজেন দেহ হইতে বাহির হয়, তাহার উৎস কি ?

উত্তর ঃ সালোকসংশ্লেষের ফলে যে অক্সিজেন দেহ হইতে বাহির হয় তাহার উৎস জল।

৬। **প্রশ্ন ঃ** কোন্ প্রকার উদ্ভিদকলায় সালোকসংশ্লেষ সংগঠিত হয় ?

উত্তর ঃ উদ্ভিদের পাতায় অবস্থিত মেসোফিল কলায় সালোকসংশ্লেষ সংগঠিত হয়।

৭। **প্রশ্ন ঃ** সালোকসংশ্লেষকে অঙ্গার আত্তীকরণ প্রক্রিয়া বলা হয় কেন ?

উত্তর ঃ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইডের কার্বন বা অঙ্গার উদ্ভিদদেহে উৎপন্ন খাদ্যে অঙ্গীভূত হয় বলিয়া সালোকসংশ্লেষকে অঙ্গারআত্তীকরণ প্রক্রিয়া বলে।

৮। **প্রশ্ন ঃ** কোন্ উদ্ভিদের মূলে সালোকসংশ্লেষ হয় ?

উত্তর ঃ অর্কিডের মূলে সালোকসংশ্লেষ হয় ?

৯। **প্রশ্ন ঃ** এমন দুটি প্রাণীর নাম কর যাহারা সালোকসংশ্লেষ করিতে পারে ?

উত্তর ঃ ইউগ্লিনা ও ক্লাইসিমিবা দুটি প্রাণী যারা সালোকসংশ্লেষ করিতে পারে।

১০। **প্রশ্ন ঃ** সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন উপজাত বস্তুটি কি ?

উত্তর ঃ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন উপজাত বস্তুটি অক্সিজেন।

১১। **প্রশ্ন ঃ** সালোকসংশ্লেষ হার কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় পরিত্যক্ত অক্সিজেন ও গৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইডের অনুপাতকে বলে সালোকসংশ্লেষ হার।

১২। **প্রশ্ন ঃ** সালোকসংশ্লেষকে জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া বলা হয় কেন ?

উত্তর ঃ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় জল জারিত ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বিজারিত হয় বলিয়া সালোকসংশ্লেষকে জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া বলে।

১৩। **প্রশ্ন ঃ** ফটোলিসিস কি ?

উত্তর ঃ যে প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিল সূর্যালোকের ফোটন কণা শোষণ করে সক্রিয় হয়ে জলকে হাইড্রোজেন (H^+) এবং হাইড্রক্সিল (OH^-) আয়নে ভেঙ্গে দেয় সেই প্রক্রিয়াকে বলে ফটোলিসিস।

$$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$$

এই হাইড্রক্সিল আয়নই সালোকসংশ্লেষে উদ্ভূত অক্সিজেন উৎপন্ন করে। এবং বিজ্ঞানী হিলের নামানুসারে এই বিক্রিয়াটিকে বলে হিল বিক্রিয়া।

১৪। **প্রশ্ন ঃ** কমপেনসেশন পয়েন্ট কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ আলোকের যে প্রখরতায় উদ্ভিদের শ্বসনে গৃহীত অক্সিজেন ও সালোকসংশ্লেষে বর্জিত অক্সিজেনের পরিমাণ সমান হয় তাহাকে বলে কমপেনসেশন পয়েন্ট।

১৫। **প্রশ্ন ঃ** সালোকসংশ্লেষে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শর্তগুলো কি কি ?

উত্তর ঃ সালোকসংশ্লেষে বাহ্যিক শর্তগুলি যথাক্রমে ক) আলোক খ) কার্বন ডাই-অক্সাইড গ) জল ঘ) উষ্ণতা এবং আভ্যন্তরীণ শর্তগুলি যথাক্রমে i) ক্লোরোফিল ii) পাতার শারীরস্থান iii) সালোকসংশ্লেষ জাত পদার্থের সঞ্চয় iv) পটাসিয়াম ও v) উৎসেচক।

বুলচন্দ্রপুর, পাঁইটা, বর্ধমান

স্যার আর্থার কোনান ডোয়েলের…

দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড

চিত্রকাহিনী
গৌতম কর্মকার

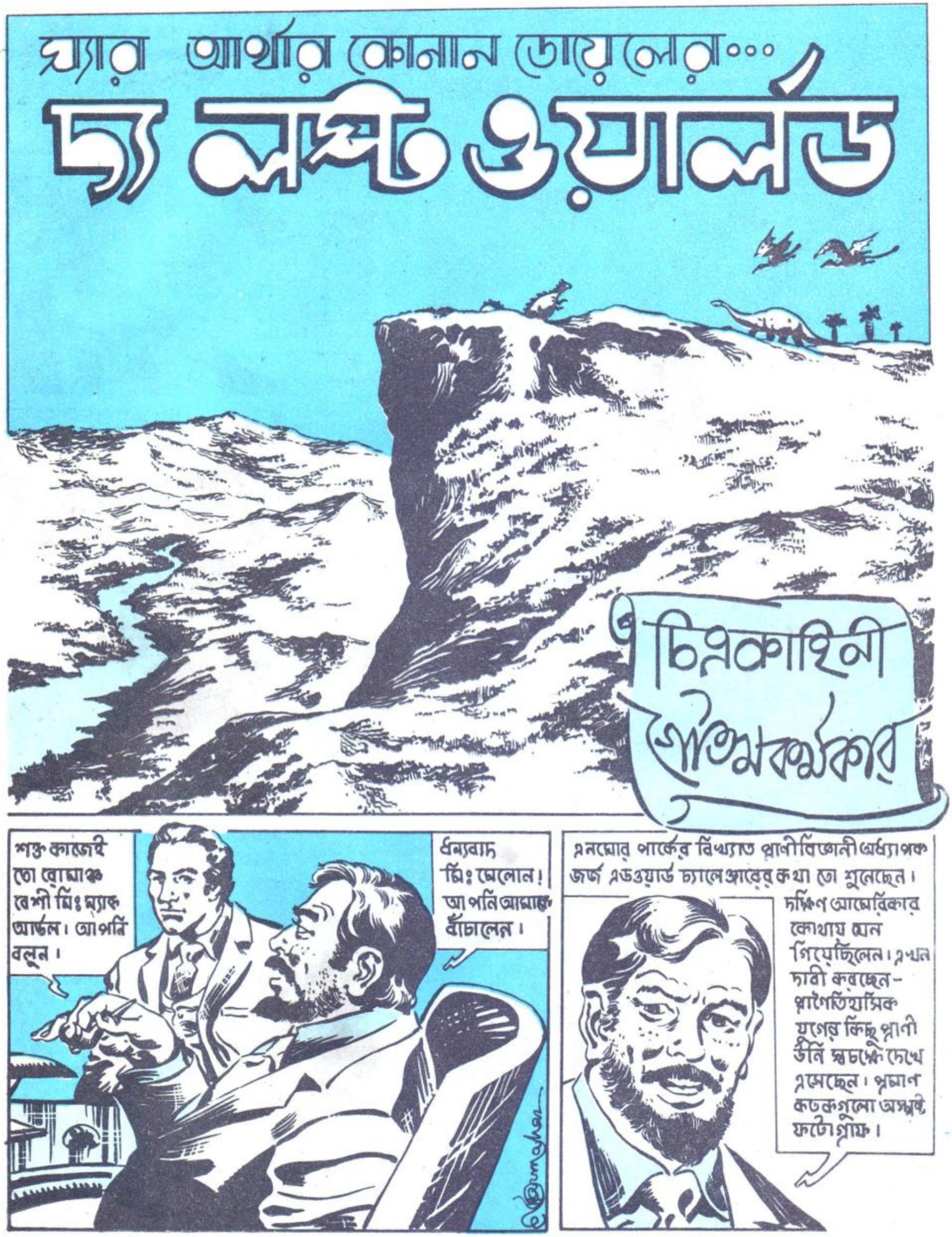
শক্ত কাজেই তো রোমাঞ্চ বেশী মিঃ ম্যাক আর্ডল। আপনি বলুন।
ধন্যবাদ মিঃ মেলোন! আপনি আমাকে বাঁচালেন।
এনমোর পার্কের বিখ্যাত প্রাণীবিজ্ঞানী অধ্যাপক জর্জ এডওয়ার্ড চ্যালেঞ্জারের কথা তো শুনেছেন। দক্ষিণ আমেরিকার কোথায় যেন গিয়েছিলেন। এখন দাবী করছেন - প্রাগৈতিহাসিক যুগের কিছু প্রাণী উনি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। প্রমাণ কতকগুলো অস্পষ্ট ফটোগ্রাফ।

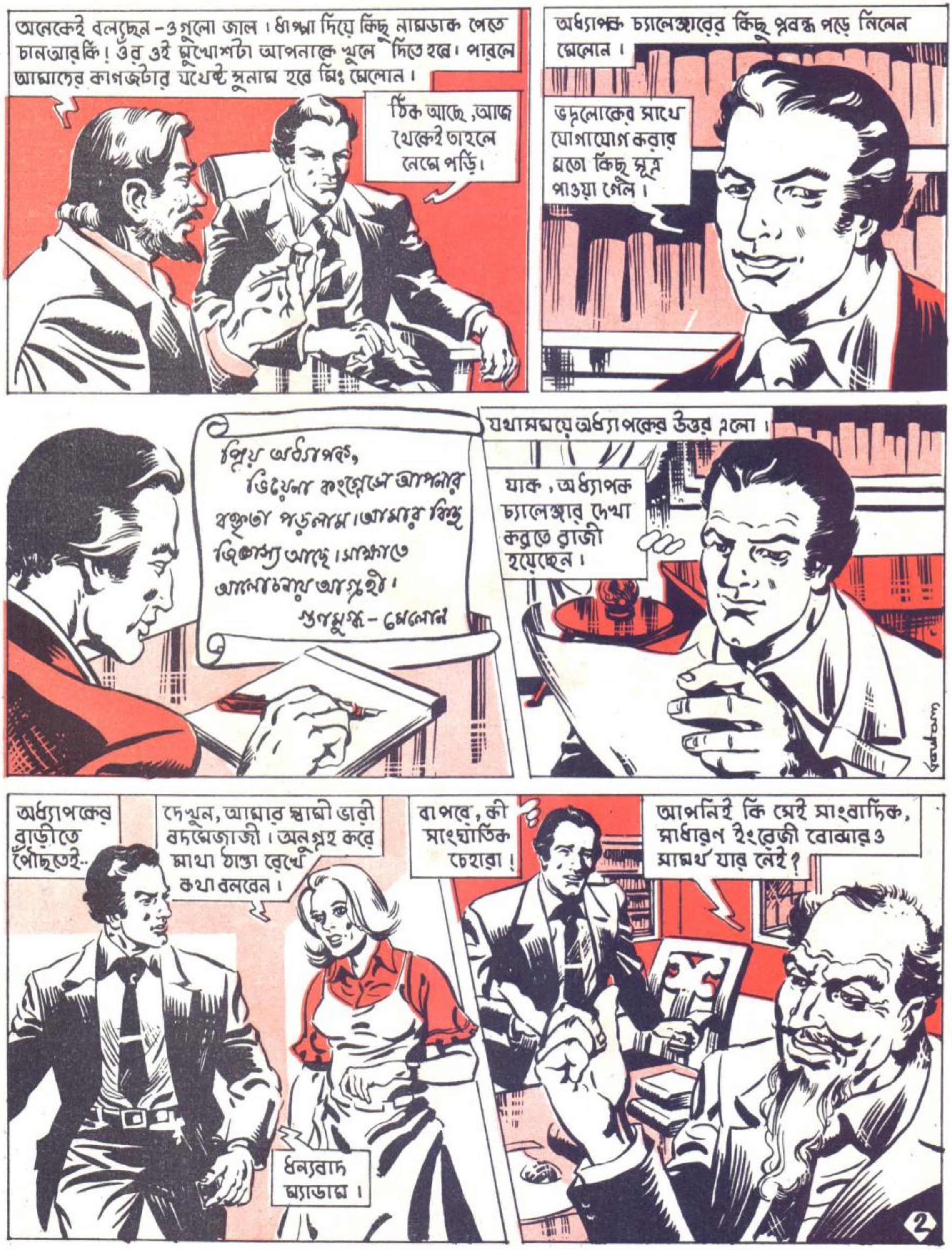
অনেকেই বলছেন -ওগুলো জাল। ধাপ্পা দিয়ে কিছু নামডাক পেতে চান আর কি! ওঁর ওই মুখোশটা আপনাকে খুলে দিতে হবে। পারলে আমাদের কাগজটার যথেষ্ট সুনাম হবে মিঃ মেলোন।
ঠিক আছে, আজ থেকেই তাহলে নেমে পড়ি।
অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারের কিছু প্রবন্ধ পড়ে নিলেন মেলোন।
ভদ্রলোকের সাথে যোগাযোগ করার মতো কিছু সূত্র পাওয়া গেল।
প্রিয় অধ্যাপক, ভিয়েনা কংগ্রেসে আপনার বক্তৃতা পড়লাম। আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। সাক্ষাতে আলোচনায় আগ্রহী। গুণমুগ্ধ - মেলোন
যথাসময়ে অধ্যাপকের উত্তর এলো।
যাক, অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার দেখা করতে রাজী হয়েছেন।
Gautam
অধ্যাপকের বাড়ীতে পৌঁছতেই..
দেখুন, আমার স্বামী ভারী বদমেজাজী। অনুগ্রহ করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কথা বলবেন।
ধন্যবাদ ম্যাডাম।
বাপরে, কী সাংঘাতিক চেহারা!
আপনিই কি সেই সাংবাদিক, সাধারণ ইংরেজী বোঝারও সামর্থ যার নেই?
2

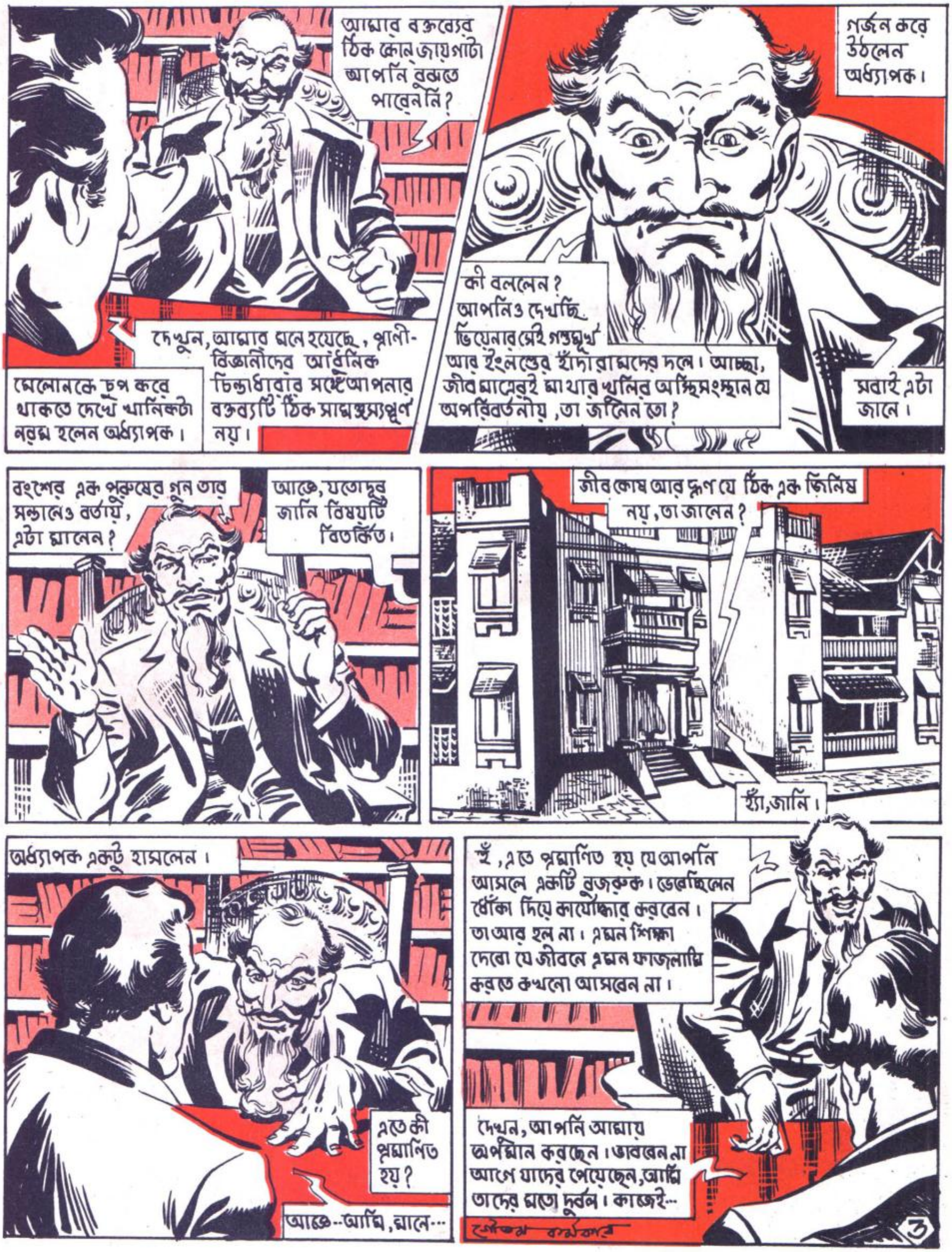
আমার বক্তব্যের ঠিক কোন্ জায়গাটা আপনি বুঝতে পারেননি?
দেখুন, আমার মনে হয়েছে, প্রাণী-বিজ্ঞানীদের আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে আপনার বক্তব্যটি ঠিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
মেলোনকে চুপ করে থাকতে দেখে খানিকটা নরম হলেন অধ্যাপক।
গর্জন করে উঠলেন অধ্যাপক।
কী বললেন? আপনিও দেখছি ভিয়েনার সেই গণ্ডমূর্খ আর ইংলন্ডের হাঁদারামদের দলে। আচ্ছা, জীবমাত্রেরই মাথার খুলির অস্থিসংস্থান যে অপরিবর্তনীয়, তা জানেন তো?
সবাই এটা জানে।
বংশের এক পুরুষের গুন তার সন্তানেও বর্তায়, এটা মানেন?
আজ্ঞে, যতোদূর জানি বিষয়টি বিতর্কিত।
জীবকোষ আর ভ্রূণ যে ঠিক এক জিনিষ নয়, তা জানেন?
হ্যাঁ, জানি।
অধ্যাপক একটু হাসলেন।
এতে কী প্রমাণিত হয়?
আজ্ঞে--আমি, মানে---
হুঁ, এতে প্রমাণিত হয় যে আপনি আসলে একটি বুজরুক। ভেবেছিলেন ধোঁকা দিয়ে কার্যোদ্ধার করবেন। তা আর হল না। এমন শিক্ষা দেবো যে জীবনে এমন ফাজলামি করতে কখনো আসবেন না।
দেখুন, আপনি আমায় অপমান করছেন। ভাববেন না আগে যাদের পেয়েছেন, আমি তাদের মতো দুর্বল। কাজেই--
গৌতম কর্মকার
৩

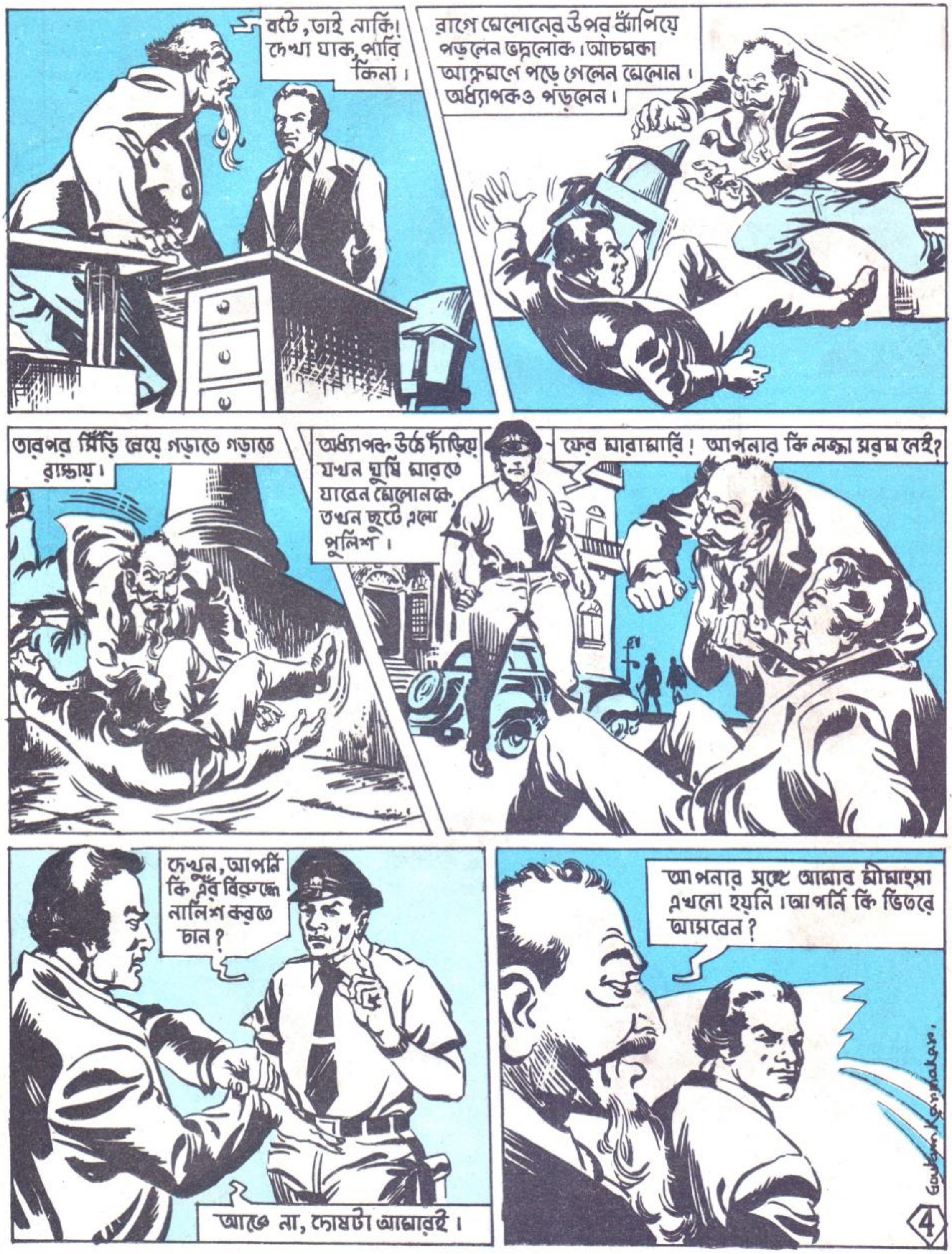
বটে, তাই নাকি। দেখ্যা যাক, পারি কিনা।
রাগে মেলোনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভদ্রলোক। আচমকা আক্রমণে পড়ে গেলেন মেলোন। অধ্যাপকও পড়লেন।
তারপর সিঁড়ি বেয়ে গড়াতে গড়াতে রাস্তায়।
অধ্যাপক উঠে দাঁড়িয়ে যখন ঘুষি মারতে যাবেন মেলোনকে, তখন ছুটে এলো পুলিশ।
ফের মারামারি! আপনার কি লজ্জা সরম নেই?
দেখুন, আপনি কি এঁর বিরুদ্ধে নালিশ করতে চান?
আজ্ঞে না, দোষটা আমারই।
আপনার সঙ্গে আমার মীমাংসা এখনো হয়নি। আপনি কি ভিতরে আসবেন?
Goutam Karmakar.
4

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় • জয়ন্ত দত্ত

এপ্রিল 84 সংখ্যার নলেজ ক্যুইজের দশ বা তার বেশি সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

কলকাতা—শৌভিক নন্দ, ঋত্বিক নন্দ, প্রদ্যোৎ কাঞ্জিলাল, দিব্যেন্দু চক্রবর্তী, শীর্ষেন্দু চক্রবর্তী, প্রণবকুমার সরকার, সুপর্ণা সরকার, রুমকি সরকার, অরুণাভ ব্যানার্জী, সান্ত্বনু ব্যানার্জী, মিত্রা মণ্ডল, রমা মণ্ডল, গৌতম মণ্ডল।

24-পরগনা—মেহেবুল ইসলাম মেসবাহুল ইসলাম, বিশ্বনাথ মজুমদার, বিদ্যুৎকুমার জ্যোতিষ, অমলকুমার গোড়ে, শ্যামলকুমার গোড়ে, কৌশিক প্রামাণিক, কুনাল প্রামাণিক, অনুকূলচন্দ্র পাল, নিরঞ্জনকুমার রায়।

হাওড়া—দীপঙ্কর ভৌমিক, তীর্থঙ্কর ভৌমিক, শ্যামদাস মুখোপাধ্যায়, পিন্টু রীত, তাপসকুমার রীত, অসিতকুমার রীত।

হুগলী—প্রদীপ প্রামাণিক, দীপঙ্কর সাহা, বিমল সাহা, শুভেন্দু দাস, দেবব্রত রায়, দেবাশীষ নিয়োগী, পার্থ কুণ্ডু।

বর্ধমান—মহাশ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুদীপ্তকুমার রায়, জয়শ্রী খাঁ, অর্ণব খাঁ, পুষ্পেন্দু চক্রবর্তী, কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী, সুদেষ্ণা চ্যাটার্জী, দেবজ্যোতি পানি, তমাল রাহা, অতনু রাহা, স্বস্তি চ্যাটার্জী, মানিকচাঁদ মারোঠী, কমলকুমার মারোঠী বরুণকুমার রেজ, সিদ্ধার্থশঙ্কর ব্যানার্জী, সুপ্রিয়া রায়, উদয়শঙ্কর চক্রবর্তী, শুভেন্দু মুখার্জী, দিব্যেন্দু মুখার্জী, সীমা মুখার্জী, অপূর্ব দেব, পার্থসারথি মণ্ডল, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, বনানী বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেদিনীপুর সোমনাথ ঘোষ, মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল, নীতিস পাড়ুই, সুধাংশু মণ্ডল, নিবেদিতা প্রামাণিক, পরিমল বেরা, লতিকা বেরা, সুজিত দাস, অসিত কাণ্ডার, অমিতাভ বোস, সব্যসাচী বসু, পার্থপ্রতিম বসু, সঞ্জয় বসু, প্রসেনজিৎ বসু, প্রদীপ সরকার।

নদীয়া—সুজিতকুমার খাঁ, প্রবীর চক্রবর্তী, সুবীর চক্রবর্তী, শান্তনু চক্রবর্তী।

মুর্শিদাবাদ—পলাশ মোহান্ত, বিকাশ মোহান্ত, মানস মোহান্ত, ইউসুফ হাসান।

বীরভূম—মন্দিরা ভদ্র, মতিউর রহমান, দীপনারায়ণ দত্ত, রত্না দত্ত, অশোক ঘোষ, সুমিতা ঘোষ।

বাঁকুড়া—দেবাশিষ দাস, শুভাশিষ দাস।

পুরুলিয়া—মিঠু ঘটক, জয়ন্তকুমার ঘটক, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, মুপ্রভাত, পাপিয়া ও সুব্রত সেনগুপ্ত।

পঃ দিনাজপুর—শান্তনু দাস।

[উত্তর মে মাসের 20 তারিখের মধ্যে আমাদের দপ্তরে পাঠাতে হবে। 10 বা তার বেশী সঠিক উত্তর দাতাদের নাম পরের সংখ্যায় ছাপা হবে।]

গত সংখ্যার নলেজ ক্যুইজ-এর সমাধান

1. ভারত মহাসাগরে 2. মহাকাশফেরী 'কলম্বিয়া' 3. কিউবা 4. রাজস্থানে 5. 25 বছর 6. মা টেরিজা 7. 1984 সালে লস এঞ্জেলসে 8. লেনিন 9. ক্যালোরি 10. দশ বছর 11. এক ধরনের পদার্থ, যাতে প্রোটিন আছে 12. থার্মোস্ট্যাট 13. পুনে 14. আসামের ডিগবয় নামক স্থানে 15. ওয়াশিংটনে অবস্থিত ইউনাইটেড স্টেট্স এর সুপ্রিম কোর্ট বিল্ডিং।

নিজে নিজে কর

বেতার তরঙ্গ প্রেরক ও গ্রাহক ব্যবস্থা

সেখ সামসুদ্দিন

বেতার তরঙ্গের সাহায্যে যে শব্দ প্রেরণ করিতে হইবে তাহাকে প্রথমেই তড়িৎস্পন্দনে রূপান্তরিত করিয়া লইতে হয় অর্থাৎ পরিবর্তনশীল শব্দ তরঙ্গকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত করিতে হয়। এইতরঙ্গের বিস্তার অত্যন্ত অল্প হওয়ায় সরাসরি দূরে পাঠাইয়া দেওয়া যায় না। তাই এই তরঙ্গকে বিবর্ধকের মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে বিবর্ধিত করিতে হয়। তারপর একটি স্পন্দকের সাহায্যে অত্যন্ত উচ্চ কম্পাঙ্ক-বিশিষ্ট তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়া এবং শব্দের আনুপাতিক বর্ধিত তড়িৎ তরঙ্গকে মড্যুলেটর (Modulator)-এর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয় 1 নং চিত্রের ন্যায়। কারণ এই মড্যুলেটরের কাজই হইতেছে ঐ দুইটিকে মড্যুলেশন (Modulation) করা বা মিশ্রিত করা। এই মিশ্রিত তরঙ্গকে আবার একটি বিবর্ধকের মধ্যে পাঠাইতে হয়। এই বিবর্ধিত তড়িৎ তরঙ্গ অ্যানটেনা (Antenna)-তে প্রযুক্ত করিলে, এই অ্যানটেনায় তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গকে ঈথারের মধ্যে ছড়াইয়া দেয়। রেডিও গ্রাহক যন্ত্র এই বেতার তরঙ্গ হইতে প্রেরিত শব্দ সঙ্কেত পুনরুদ্ধার করে।

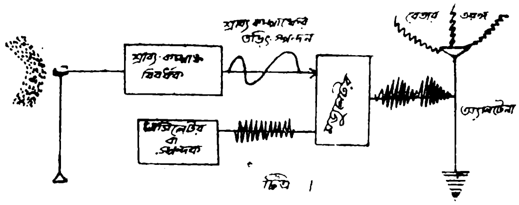
শ্রাব্য কম্পাঙ্কের তড়িৎ স্পন্দন
বেতার তরঙ্গ
শ্রাব্য কম্পাঙ্ক বিবর্ধক
মড্যুলেটর
অ্যানটেনা
অসিলেটর বা স্পন্দক

চিত্র 1

বাড়িতে রেডিও শুনিবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হইয়া থাকে প্রকৃতপক্ষে তাহাই বেতার গ্রাহক যন্ত্র। ইহাই কার্য পদ্ধতি 2 নং চিত্রে দেখানো হইল। বেতার স্টেশন হইতে আগত তড়িচ্চুম্বকীয় সঙ্কেত গ্রাহক যন্ত্রের এরিয়্যাল (Aerial)-এ ধরা পড়ে। ফলে উহাতে উচ্চ কম্পাঙ্কের তড়িৎ আবিষ্ট হয়। এই ক্ষীণ অসিলেটর (Oscilator) কে প্রথমে একটি বিবর্ধকের মধ্য দিয়া পাঠাইতে হয়। বিবর্ধিত সঙ্কেতকে তারপর ডিটেকটর (Detector)-এর মধ্য দিয়া পাঠাইতে হয়। কারণ ডিটেকটরের কাজই হইল মিশ্রিত তড়িৎতরঙ্গকে আলাদা করা। তারপর একমুখী অভিশ্রুত তরঙ্গ (Modulated wave)-কে একটি শ্রাব্য কম্পাঙ্ক বিবর্ধক (audio-frequency amplifier)-এর মধ্য দিয়া পাঠাইয়া বাক্ তরঙ্গকে বিবর্ধিত করিয়া লইতে হয়। বিবর্ধিত বাক্তরঙ্গকে লাউড স্পীকার (Loud Speaker)-এর মধ্য দিয়া পাঠাইলে প্রেরিত শব্দানুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি শোনা যায়।

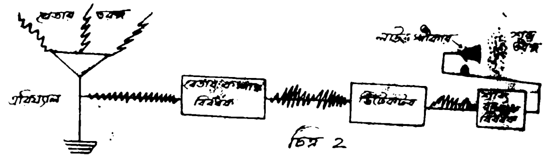
বেতার তরঙ্গ
এরিয়্যাল
বেতার কম্পাঙ্ক বিবর্ধক
ডিটেকটর
শ্রাব্য কম্পাঙ্ক বিবর্ধক
লাউড স্পীকার
শব্দ তরঙ্গ

চিত্র 2

একাদশ শ্রেণী, মেমারী বিদ্যাসাগর স্মৃতি বিদ্যামন্দির, মেমারী, বর্ধমান।

গত সংখ্যার রোবট কূটের সমাধান

			কো	বা	ল্ট			
			■	র্কে	■			
			দু	লি	ন			
				য়া				
হা	উ	স	■	ম	■	নি	কে	ল
ব		ক্রে	ন	■	ক্সা	উ		রে
কি		টি	■	পে	■	ট		ন
উ		স	■	ট্রো	■	ন		সি
লি		■	ব	ল	য়	■		য়া
স		ক	■	■	■	দা		ম
		ড	ল	মা	ই	ট		
			গ্যা		ন			
			দি		সু			
			র		লি			
			ম		ন			
			■		■			
			থ		ক্ষা			
		সো	না		র	ঙ		

নলেজ কুইজ

সঙ্কলক ঃ অমরনাথ রায়

1. একজন সুস্থ মানুষের (বয়স্ক) হৃদ্‌স্পন্দন প্রতি মিনিটে কত বার ঘটে ?

2. এটি কিসের ছবি ?

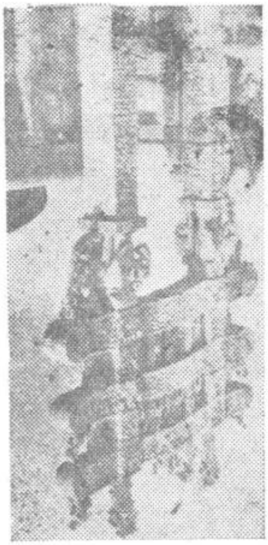

3. কোন্ নদীর তীরে 'নাসিক' শহর অবস্থিত ?

4. এমন একটি ধাতুর নাম বল, যা শীতল জলের সঙ্গে বিস্ফোরণ সহকারে তীব্র বিক্রিয়া ঘটায়।

5. পৃথিবীতে সর্বপ্রথম জীবের আবির্ভাব ঘটে স্থলে জলে, না অন্তরীক্ষে ?

6. মীরাবাঈ কে ছিলেন ?

7. পাশের ছবিটি একজন বিখ্যাত ক্রিকেটারের। নাম কি ?

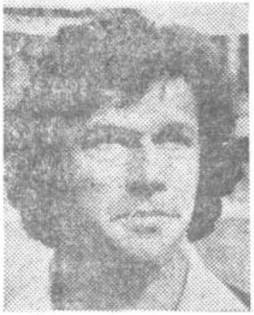

7নং প্রশ্নের ছবি

8. মকবুল ফিদা হুসেন এর নাম কি জন্য বিখ্যাত ?

9. বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইন স্টাইন কোন্ দেশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ?

10. যে মৌলের পরমাণু ক্রমাংক 54, তার নাম কি ?

11. 'জুপিটার' এর ক'টি উপগ্রহ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে ?

12. কোন্ খেলার সঙ্গে 'Pitcher' শব্দটি জড়িত ?

13. পাশের ছবিটি কিসের ?

13নং প্রশ্নের ছবি

(সমাধান প্রকাশিত হবে পরবর্তী সংখ্যায়)

পরীক্ষার জন্য তৈরী হও

উপরের শিরোনামে আমরা একটি নতুন ফিচার বছরের শুরুতে রাখার কথা চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু প্রয়োজনীয় সব তথ্য যথাসময়ে আমাদের হাতে এসে না পৌঁছনোয় পরবর্তী সংখ্যার জন্য অপেক্ষা করতে হল। যারা নানারকম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসতে ইচ্ছুক—তাদের কথা ভেবে আমরা এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খবরটি নিয়মিত প্রকাশ করবো। এই পাতায় তোমরা কোথায় কবে কি ধরনের পরীক্ষা হবে কিংবা কেমন করে সেই সব পরীক্ষার জন্য তৈরী হবে সেইসব খবর নিয়মিত পাবে। আশা করা যাচ্ছে—এর ফলে তোমরা নিশ্চয়ই উপকৃত হবে। তাছাড়া তোমরাও এই বিভাগে কি কি পেতে চাও বা কি কি পেলে অত্যন্ত লাভবান হতে পারবে এখনই চটপট লিখে জানাও।

—সম্পাদক

রহস্যের অন্তরালে

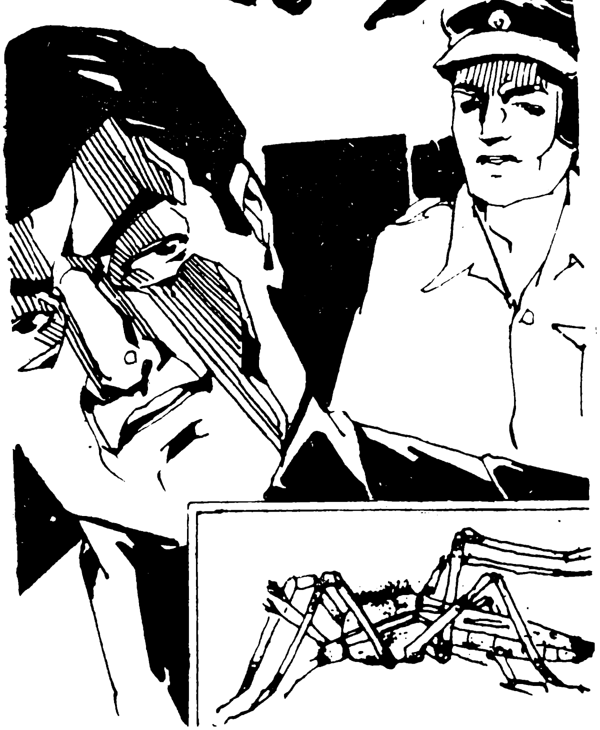

সুদীপ্ত দাশগুপ্ত

"এত মন দিয়ে কি পড়ছিস রে জয় ?"

আমি নিঃশব্দে কাগজের একটা পাতা প্রদীপ্ত কাকুর চোখের সামনে মেলে ধরলাম।

আপন মনেই বললেন প্রদীপ্ত কাকু, "হুঁ, ব্যাপারটা আমাদেরও ভাবিয়ে তুলেছে। 'বিগত কয়েকদিন যাবৎ এই কলকাতায় পরপর তিনটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। দেহে আঘাতের চিহ্ন নেই, অথচ হৃৎপিণ্ডের ভিতরে বিষ প্রয়োগ..."

"আচ্ছা কাকু, যদি মৃতকে বিষপান করান হয় ?"

—"না, সেক্ষেত্রে বিষ হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করবে না। এক্ষেত্রে ইঞ্জেকশন বা সেই ধরনের অন্য কিছু দিয়ে শরীরে বিষ প্রয়োগ করান হয়েছে। কিন্তু মুশকিল হ'ল চামড়ার উপর কোনো ছিদ্র বা আঘাতের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এমন কি জিনিস পাওয়া যায় যা দিয়ে হৃৎপিণ্ডের ভিতরে বিষ প্রবেশ করান যায় ?"

হঠাৎ প্রদীপ্ত কাকুর ফোন—শীগগীরচলে আয়.....।

কোনো রকমে হাত মুখ ধুয়ে একদিন প্রদীপ্ত কাকুর কথামত সূর্য সেন স্ট্রীটে হাজির হয়েছি। প্রদীপ্ত কাকু মৃদু হেসে বললেন, "সেই এক ঘটনা, হৃৎপিণ্ডে বিষ প্রয়োগ। এবার খুনীর শিকার হয়েছেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ অমিতোষ সোম। তাকে খুব তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। হয়ত এক্ষেত্রে তিনি বেঁচে যাবেন।"

...রাত্রিবেলা আমি আর প্রদীপ্ত কাকু ডঃ সোমের কামরার বাইরে একটা ছিদ্র দিয়ে তাকে সতর্ক প্রহরায় রাখলাম।

রাত নটা...সাড়ে নটা...দশটা...সামনে শুধু প্রতীক্ষা। নির্জন জায়গায় ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দ শোনা যাচ্ছে শুধু। রাত সাড়ে দশটা, এবার কিছুটা ফাঁক হ'ল ঘরের দরজা। আগন্তুক এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল, এদিকে সেদিকে সতর্ক চোখ বোলাল অতি সন্তর্পণে।

আগন্তুকের হাতে একটা ছোট্ট টিনের কৌটো, সেটা নিয়ে সে চকিতে এগিয়ে গেলো ঘুমন্ত ডঃ সোমের বিছানার দিকে। প্রদীপ্ত কাকু হঠাৎ এক ছুটে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। তার হাতে উঠে এল রিভলবার। চিৎকার করে উঠলেন, "ডঃ চাক্‌লাদার, আপনার খেল্ খতম্।"

"ডঃ অরবিন্দ চাক্‌লাদার একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। উনি বর্তমানে মশা ও তার দেহের বিষ প্রয়োগ নিয়ে গবেষণা করছেন।" প্রদীপ্ত কাকু বলে চলেন।

"আমি প্রথম থেকেই ভাবছিলাম, দেহের চামড়ায় কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই, ভয় পেয়েও মৃত্যু হয়নি, তাহলে ?

এমন সময় 'স্টেট্‌সম্যান' কাগজে একদিন ডঃ চাক্‌লাদার একটা ইংরাজী প্রবন্ধ লিখে আভাষ দিলেন যে তিনি মশা ও তার শরীরের বিষ প্রয়োগ নিয়ে গবেষণা করছেন। তখন আমি ঘটনাটা সাজিয়ে নিলাম অনুমানের ভিত্তিতে। ডঃ চাকলাদার আফ্রিকা থেকে আনা এক ধরনের বড় শুঁড় বিশিষ্ট মশার দেহে বিষপ্রয়োগ করে দেখলেন যে এতে এদের তো মৃত্যু হয়ই না, বরং এরা তীক্ষ্ণ শুড় দিয়ে এই বিষ মানুষের হৃৎপিণ্ডে ঢুকিয়ে নিজেকেও জ্বালা যন্ত্রণা থেকে থেকে মুক্ত করে। এই মশার সাহায্যেই তিনি ডঃ সোমকে খুন করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ডঃ সোমের গায়ের চামড়া খুব মোটা হওয়ার ফলে ভাগ্যক্রমে বিষ হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করতে পারল না। তখন ডঃ চাক্‌লাদারের সন্দেহ হ'ল ডঃ সোম সুস্থ হয়ে উঠে পুলিশের কাছে হয়ত সব রহস্য ফাঁস করে দেবেন। সেই জন্যে ডঃ চাকলাদার দ্বিতীয়বার ডঃ সোমকে খুন করার চেষ্টা করলেন।"

প্রদীপ্ত কাকুর হাতে ধরা রয়েছে সেই বিষাক্ত আফ্রিকান মশা ভর্তি টিনের কৌটোটা। ওটা এখন আটকে রাখা হয়েছে ঢাকনা দিয়ে। ভিতর থেকে 'খস্ খস্' আওয়াজ শোনা যাচ্ছে মশাগুলোর নড়াচড়ার। বিষের তীব্র জ্বালায় ওরা ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছে।

263, বৈকুণ্ঠদেব রোড, মধ্যমগ্রাম, 24 পরগনা।

ভেবে ভেবে বল

শুভব্রত রায়চৌধুরী

1) নীচে চারটি গাছের ছবি দেওয়া হোল। এই গাছগুলি থেকে বিভিন্ন প্রকার মাদক দ্রব্য ও যন্ত্রণা নিবারণের ওষুধ তৈরি করা হয়। এদের নাম বল।

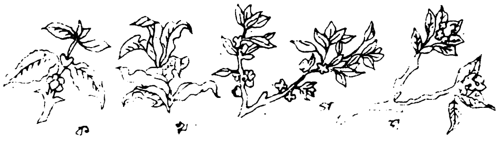

2) নীল রক্ত আবার হয় নাকি ? কাদের হয় ভেবে বল ?

3) 1930 সালের 11ই ফেব্রুয়ারি টমবো নামে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী একটি গ্রহের আবিষ্কার ঘটিয়েছিলেন। এর নামটি ভেবে বল ?

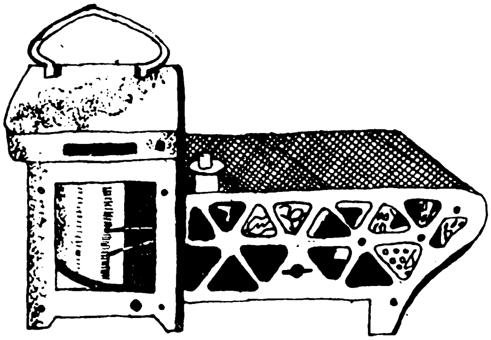

4) উপরের ছবিটি বাতাসের আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা পরিমাপ করবার একটি যন্ত্র। এর নাম ভেবে বল ?

5) আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের আবহাওয়া পরিমাপ করবার জন্য কয়েকটি সংকেত ব্যবহার করেন। 0—9 পর্যন্ত সংখ্যার নীচে সংকেতগুলোর নাম ভেবে বল ;

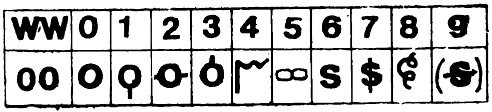

WW	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00	O	ϙ	-O-	ȯ	⌈~	∞	S	$	∮	(S)

ভেবে ভেবে বল উত্তর

1) (ক) কফি (Caffeine) (খ) নিকোটিন (Nicotine) (গ) কোকেন (Cocaine) (ঘ) রিজারপিন

2) কাঁকড়া বিছে, অক্টোপাস, কাটল ফিস্ এর রক্ত নীল।

3) PLUTO 4) হাইগ্রোথারমোগ্রাফ (HYGROTHERMOGRAPH)

5) 0 - মেঘ নেই, 1—মেঘ কমে যাচ্ছে, 2—সারাক্ষণ মেঘ আছে, 3—মেঘ - বাড়ছে ; 4 - ধোঁয়া, 5—আবছা, 6—বাতাসে ধূলি কণা, 7—ঝড়ো বাতাস ধূলিকণা সহ, 8—বালি/ধূলিকণা সমানুপাত, 9—বালি ঝড়।

শব্দকূট

রণবীর বসু

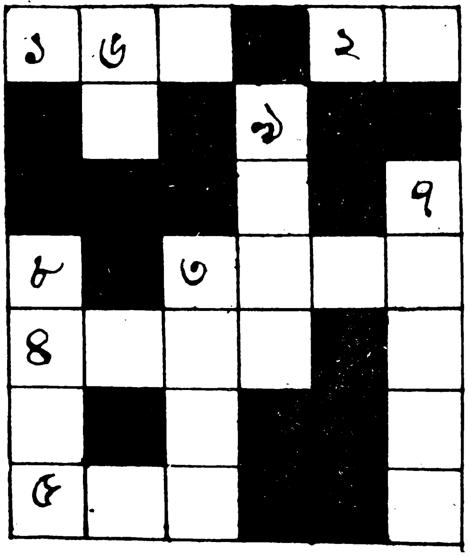

১	৬		■	২	
■		■	৯	■	■
■	■	■		■	৭
৮	■	৩			
৪				■	
	■		■	■	
৫			■	■	

সূত্র : পাশাপাশি—

1. লেডের আকরিক
2. উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধির সহায়ক
3. দিয়াশলাই-এর আবিষ্কর্তা
4. সবচেয়ে ভারী ধাতু
5. রসায়নের পরীক্ষায় বা বিক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় বস্তু।
6. খাদ্যের উপাদানগুলির অন্যতম একটি উপাদান
7. প্রোজেকটরের অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু।
8. সন্ধিপদী পর্বের অন্য এক নাম।
9. এমন দুই প্রকার উদ্ভিদ যারা একে অপরের সাহায্য নিয়ে বেঁচে থাকে।
10. এমন এক প্রকার নিষ্ক্রিয় গ্যাস যা আজ কাল বেলুনে ব্যবহৃত হয়।

10, গ্যালিফ ষ্ট্রীট. কলি-3

প্রশ্নোত্তর

সুধাংশু পাত্র

তোমাদের সুবিধার জন্য এবার থেকে তোমাদেরই প্রশ্নগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করে উত্তর দেওয়া হচ্ছে। দেখা গেছে, তোমাদের প্রশ্নগুলির অধিকাংশই জীবনমুখী। অর্থাৎ প্রাত্যহিক জীবনে তোমরা যে সব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হও সেইগুলিকে অবলম্বন করে। তাই “প্রতিদিনের বিজ্ঞান ভাবনা” ও “অন্যান্য প্রশ্ন” এই দুটি বিভাগের প্রবর্তন করা হল। বলা বাহুল্য তোমরা যাতে আরও জিজ্ঞাসু হতে পারতার জন্য প্রথম বিভাগে তোমাদের প্রশ্নগুলি ছাড়াও কিছু কিছু নতুন প্রশ্নের সংযোজন করা হল। এই প্রসঙ্গে তোমাদের যদি আরও জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে পরবর্তী সংখ্যার জন্য রাখবে।

প্রতিদিনের বিজ্ঞান ভাবনা ঃ

সন্ধ্যে হলে তেঁতুল কিংবা শিরীষের পাতা যেমন ঝিমিয়ে পড়ে তেমনই রাত বাড়লে অপরাজিতার পাপড়ির মতো তোমাদের সুন্দর চোখদুটিও ঘুমে জড়িয়ে আসে। আবার ভোর হলে আপনিই খুলে যায়।

এই ঘটনাটুকুকে কেন্দ্র করে মনে কতই না প্রশ্ন আসে। ঘুম কেন আসে এবং যথাসময়ে কেন ভেঙ্গে যায়? ঘুমের ঘোরে কেন স্বপ্ন দেখি? স্বপ্ন কি রোগ? মাঝরাতে বোমা পটকা ফাটলেও ঘুম ভাঙ্গে না অথচ সকালে সামান্য কোলাহলে কেন ঘুম ছুটে যায়? ঘুম পেলে কেন হাই উঠে?

এদের মধ্যে দুটি প্রশ্ন রেখেছো বসিরহাট থেকে সঞ্জয় হালদার এবং বর্ধমান থেকে প্রদীপ হালদার।

আমাদের মাথার ভেতরে যে মগজ আছে সে যেন এক রাজা। রাজার সৈন্যসামন্তের মতো মগজ থেকে অসংখ্য স্নায়ু দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে আছে। দর্শন, ঘ্রাণ, স্বাদ গ্রহণ, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, ব্যথা, গরম, ঠাণ্ডা প্রভৃতি সবকিছুর অনুভূতির মূলে আছে স্নায়ুদেরই একমাত্র ভূমিকা।

সারাটা দিন ধরে মগজকে, স্নায়ু ও মাংসপেশীগুলিকে কত হরেক রকমেরই না কাজ করতে হচ্ছে। তাই তারাও বিশ্রাম করতে চায়, অবসাদ থেকে মুক্তি পেতে চায়। ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে ওঠায় ফুসফুসে যে পরিমাণ অক্সিজেন প্রবেশ করে তাও শরীরের চাহিদা অনুযায়ী অনেক কম। তখন অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণের জন্য মুখগহ্বর দিয়ে অতিরিক্ত কিছু অক্সিজেন হাই ওঠার মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করে।

বেশীক্ষণ এইভাবে চলতে পারে না। এক সময় ঘুম আসে। প্রথমের দিকে ঘুম গাঢ় হয়। তারপর একটু একটু করে পাতলা হতে থাকে। অবশেষে আলো, শব্দ প্রভৃতি সামান্য উত্তেজকের স্পর্শে স্নায়ুসমূহ উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং ঘুম ভেঙ্গে যায়। অবশ্য ঘুম ভাঙ্গার মূলে প্রতিদিনের অভ্যাসও অনেকখানি দায়ী।

ঘুমের ঘোরে সবাই স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখার অবশ্য অনেক কারণ আছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, আমরা দিনের বেলায় যে সব কথা চিন্তা করি বা কাজকর্ম করে থাকি' পূর্ণ বিশ্রামের সময় মন সেইগুলি পর্যালোচনা করে এবং বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে বলে মনে হয়। তবে স্বপ্ন দেখা কোন রোগ নয়।

অন্যান্য প্রশ্ন ঃ

১। কিছু কিছু প্রাণী অন্ধকারে কেমন করে দেখতে পায়?

অনুপম মুখোপাধ্যায় মণ্ডলগ্রাম, বর্ধমান।

প্রত্যেকটি প্রাণীর অক্ষিপটে “রড” ও “কোণ” নামক দু'ধরনের কোষ বিদ্যমান। ওদের উপর আলো এসে পড়লে অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে খবর প্রেরিত হয় এবং তখনই কোনো বস্তু দৃষ্টির গোচরে আসে।

“কোণ” কোষগুলি কেবলমাত্র উজ্জ্বল আলোতে সাড়া দেয়। কিন্তু “রড” কোষগুলি অতি মৃদু আলোতেও সাড়া দেয়। যে সব প্রাণী অন্ধকারে দেখতে পায় তাদের অক্ষিপটে উপযুক্ত সংখ্যক রড কোষ বিদ্যমান। অন্ধকারে যারা দেখতে পায়না তাদেরও রড় কোষ থাকে। তবে অন্ধকারে দেখতে হলে যত থাকার দরকার সে পরিমাণ নেই।

২। π-এর মান $\frac{22}{7}$ ধরা হয় কেন?

জয়কুমার দে, মিস্ত্রীপাড়া বর্ধমান।

x একটি নিত্য সংখ্যা এবং বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতকে বোঝায়। x-র মান সম্বন্ধে সেই আর্কিমিদিসের কাল থেকে আজও পর্যন্ত গবেষণা অব্যাহত আছে। বৃত্তের পরিধি ও ক্ষেত্রফল, শঙ্কুর বক্রতলের ক্ষেত্রফল গোলকের আয়তন নির্ণয় ইত্যাদি কাজে x-কে নিয়ে টানাটানি!

বৃত্তের পরিধির পরিমাপকে বৃত্তটির ব্যাস দিয়ে ভাগ করলে যে সংখ্যাটি ই x-র মান। ছোট বড় যে ধরনের বৃত্ত হোক না কেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত একই হয়। আর্কিমিদিস এর মান নির্ণয় করেছিলেন $3\frac{1}{7}$ বা $\frac{22}{7}$ এবং $3\frac{10}{11}$, টলেমি ধরেছিলেন 3·1416। আসলে ওর মান একেবারে নির্ভুলভাবে প্রকাশ করা যায় না। আধুনিক কম্পিউটারের সাহায্যে দশলক্ষ দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় করা হয়েছে।

তোমরা হাতেনাতে পরীক্ষাও করতে পার। মোটা কাগজের ছোট বড় কয়েকটা বৃত্ত কেটে প্রত্যেকের পরিধিও ব্যাস সরু সূতো দিয়ে মেপে অনুপাত নাও। দেখবে $\frac{22}{7}$ না হলেও তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত অবশ্যই মিলবে।

আলসার বা ক্ষতরোগ সম্বন্ধে টুকিটাকি

অসীমকুমার চক্রবর্ত্তী

আলসার বা ক্ষতরোগ সম্বন্ধে জানতে হ'লে আগে জানা দরকার এটা কি ? শরীর-এর কোন একটা অঞ্চলের মাংস পেশীর (ইংরেজীতে টিস্যুর tissue) কোন কারণ বশতঃ ক্রমে ক্রমে ধ্বংস এবং গলে গিয়ে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তাকেই আমরা বলি আলসার (Ulcer) বা ক্ষতরোগ।

এই রোগ এর সর্বমোট তিনটি পর্যায় বা phase।

আলসার তিনটি ভাগে বিভক্ত। (1) স্পেসিফিক্ (Specific) বা, বিশেষ জীবাণু মুক্ত বিশেষ ক্ষত। (2) ম্যালিগন্যান্ট (Malignant)। মারাত্মক ও পুরানো ক্ষত ! (3) নন্-স্পেসিফিক (Non-Specific) বিশেষ বিষাক্ত গুণহীণ ক্ষত। একে সিম্পল আলসারও (Simple Ulcer) বলে।

এই নন্-স্পেসিফিক বা সিম্পল আলসার আবার মোট ৪টি ভাগে বিভক্ত।

(1) সুস্থ ক্ষত বা হেলদি বা হিলিং আলসার, যা গোল বা ডিমের মত দেখতে। ক্ষতস্থানটি বেশ শুষ্ক, গভীর ও সংকুচিত হয়ে থাকে। এইরকম ক্ষতস্থান-এর চিকিৎসার সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যাহাতে ক্ষতস্থানে পচন না ধরে। এই রোগের ওষুধ হিসাবে সাধারণতঃ Mybacin, Betnovate—C or, N ব্যবহার করা হয়। যদি সহজে রোগটি না সারে তবে স্কীন্ গ্রাফটিং বা জায়গাটুকু চাঁছিয়া ফেলা হয় !

(2) দুর্বল ক্ষত বা, উইক্ আলসার→ এই রোগে ঐ সব স্নিগ্ধ মলম আর রোগী যাহাতে দুর্বল না হয়ে পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। কারণ এই দুর্বল আলসারে রোগী প্রচণ্ড দুর্বল হয়। ফলে রোগীকে অতি অবশ্য বলকারক খাবার দাবার দিতে হয় ও ক্ষতমুখ সব সময় পরিষ্কার রাখা হয়।

(3) কঠিন ক্ষত বা ইণ্ডোলেট বা ক্যালস (Endolet or, Calloius Ulcer)। এটি খুব পুরোনো ক্ষত এবং সাধারণতঃ পায়ের পাতায় দেখা দেয়। ঐ ক্ষতস্থান গভীর উঁচুনীচু মাংসস্তর দিয়ে ঢাকা থাকে আজ পুঁজ রক্ত বেরোয়। কোনও রকম ব্যাথা তেমন অনুভূত হয়না ! এই রোগের চিকিৎসা আগের দুটি রোগের মতই। এই রোগ সাধারণতঃ মধ্যবয়স্ক পুরুষদের হয়।

(4) উত্তেজিত ক্ষত বা ইরেটেবল্ আলসার (Irritable Ulcer)। এই রোগ মধ্যবয়স্ক দুর্বল স্ত্রীলোকদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। ক্ষতের আকার খুবই ছোট ও প্রচণ্ড রকমের ব্যথা হয়। অন্যান্য চিকিৎসার পরিবর্তে সাধারণতঃ এই নানারকম ঘুমের ওষুধ ও মলম ব্যবহৃত হয়।

(5) প্রদাহিত ক্ষত বা ইনফ্লেমড্ আলসার (Inflamed Ulcer)→ক্ষতস্থানটি গরম, লাল আর বেশ ফুলে থাকে। ক্ষতস্থান থেকে কফের মতো একরকম বদ্‌গন্ধযুক্ত রক্ত মিশ্রিত রস বের হয়। ফলে ব্যথাও দেখা যায়। চিকিৎসা আগের মতোই।

(6) বিগলিত ক্ষত বা শ্ল্যাফিং আলসার (Sloughing Ulcer)→ক্ষতস্থানটিতে প্রদাহের ভাবটি বেশী থাকলে ক্ষতস্থান ধূসর রং-এর শ্লাফ বা মামড়ি দিয়ে ঢাকা থাকে। এই রকম ক্ষয়রোগ সাধারণত রোগা ও দুর্বল ব্যক্তিদের হয়। এই রেগে রোগীর ইরিটেটিভ্ ফিভার নামে একরকম জ্বর হয়, ক্ষতস্থানে ব্যথা হয়, আর ক্ষতস্থান গরম হয়। নিয়মিত ড্রেসিং এবং আগে বর্ণিত অন্যান্য রোগের মত এই রোগের চিকিৎসা করা হয়।

(7) ভ্যারিকোজ শিরায় (Varicose Vein) যে সকল ক্ষত হয় তাদের 'ভ্যারিকোজ আলসার' বলে। ঐ ক্ষতস্থান প্রদাহিত বা উত্তেজিত বা গলিত অবস্থায়ও হইতে পারে কোনো কোনো সময় কঠিন ক্ষতেও এর শেষ পরিণতি। ক্ষতস্থানের ভিতরের শিরা যদি কোনো কারণ বশতঃ ছিঁড়ে যায় তবে তখন ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত হয়। চিকিৎসা :—ক্ষতস্থানে নিয়মিত ড্রেসিং ও তুলোর প্যাড ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রাখা হয়। প্রয়োজনে অবশ্য অপারেশন ও করা হয়। সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ও বিশেষ করে ক্ষতের চিকিৎসার জন্য এই ওষুধগুলো ব্যবহার করা হয় :— Calci ostelin বা, Calciostillin with Vitamin B_{12} 2ml. প্রতি 1 দিন অন্তর অথবা প্রত্যেকদিন মাংসের স্তরে ইনজেক্‌শন্ দেওয়া হয়, Oslelin forte, Penicillin, Seclomycin, Celine—এগুলোও ব্যবহার করা যেতে পারে।

(8) রক্তস্রাবী ক্ষত বা হেমারেজিক আলসার (Haemorrhagik Ulcer) এই সমস্ত ক্ষত থেকে হঠাৎ হঠাৎ প্রচুর রক্তপাত হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি স্ত্রীলোকদের অত্যাধিক হয়। এর রোগ সারানোর উপায় কি কারণে রক্তপাত হচ্ছে সে সম্বন্ধে জ্ঞান নিয়ে তারপর পূর্বের ন্যায় চিকিৎসা করা।

আরও কয়েক প্রকার আলসার :

(9) শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির বা Mucous Membrane-এর আলসার। গলা, জননাঙ্গে ইত্যাদি স্থানে এইরকম ক্ষত দেখা যায়। এই রোগের চিকিৎসা প্রায় একই রকম।

বীরপাড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি।

বিজ্ঞান সংবাদ

ডঃ গোপালচন্দ্র স্মরণসভা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতির যৌথ উদ্যোগে বিজ্ঞান সাধক ডঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের তৃতীয় বার্ষিক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় 8 এপ্রিল সত্যেন্দ্র ভবনে। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ডঃ জয়ন্ত বসু ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। গোপালচন্দ্রের বিজ্ঞান চেতনার ভূয়সী প্রশংসা করে শ্রীমিত্র বলেন, ডঃ ভট্টাচার্য ছিলেন বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক। তিনি পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে সহজ সরলভাবে মানুষের সামনে হাজির করেছেন। ফরাসী পতঙ্গপ্রেমী ফেবারের সঙ্গে তিনি গোপালবাবুর তুলনা করেন। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ 'জৈব আলো' শীর্ষক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা স্লাইড সহযোগে প্রদান করে ডঃ কান্তিলাল চৌধুরী। গোপালচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

তিন বিজ্ঞানীর জন্ম জয়ন্তী

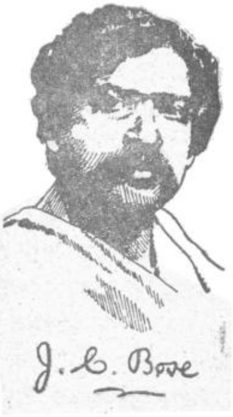

গত এক বছর ধরে বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা তাঁদের পঁচিশতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নানা ধরণের অনুষ্ঠান পালন করে চলেছেন। বৎসরব্যাপী অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে বর্তমানে তাঁরা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 125 তম, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহার 91 তম জন্মজয়ন্তীকে কেন্দ্র করে একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। এ প্রদর্শনী সুরু হয়েছে 9ই এপ্রিল চলবে 6ই মে পর্যন্ত। প্রদর্শনীতে বহু দুষ্প্রাপ্য ছবি ও পাণ্ডুলিপির সাহায্যে তিন বিজ্ঞানীর জীবনের নানা অজানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। প্রদর্শনীতে জগদীশচন্দ্রের "কোহেরার" যন্ত্রের মডেল, জগদীশচন্দ্রের ব্যবহৃত উদ্ভিদের বৃদ্ধি পরিমাপক ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্র, বনচাঁড়াল গাছের স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধকরার জন্য অসিলেটিং ফাইটোগ্রাফ যন্ত্র ও উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ পরিমাপক যন্ত্র সচল অবস্থায় দেখানো হচ্ছে। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সাংখ্যায়ন ও তার প্রয়োগ এবং খেলনার সাহায্যে বোসন ও ফার্মিয়ানস্ কণা দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। সূর্যের বর্ণছত্রে ফণ্‌হপারের কৃষ্ণরেখার শেষপর্যায়ের গবেষণায় মেঘনাদ সাহার অবদান পরীক্ষার মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে। এছাড়াও প্রদর্শনী উপলক্ষে এই তিন বিজ্ঞানীর জীবন ও কর্মের উপর লোক-রঞ্জন বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে।

দিবাকর সেন

মহাকাশে রাকেশ

ভারতের তরুণ নভশ্চর রাকেশ শর্মা সম্প্রতি রুশ নভশ্চরদের সঙ্গে মহাকাশে পাড়ি জমিয়ে আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে এসেছেন। মহাকাশে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্যাদি মহাকাশ গবেষণায় নতুন পথ নির্দেশ করবে আশা করা যায়।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

পত্রপ্রেরকদের কাছে অনুরোধ

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দপ্তরে দৈনিক প্রচুর চিঠি আসে। সে সব চিঠির বিষয়বস্তুও ভিন্ন ভিন্ন। কেউ বা লেখা পাঠান. কেউ বা অন্য কিছু। আবার লেখাও ত নানা রকমের। কেউ পাঠান ছোটদের দপ্তরে প্রকাশের জন্যে। আবার অনেকে লেখা পাঠান সাধারণ বিভাগে প্রকাশের জন্যে। লেখা ছাড়াও প্রকাশিত বিষয়ের উপরে অনেকে আলোচনা করে চিঠি পাঠান, যেগুলি 'চিঠি পত্র' বিভাগে প্রকাশিত হয়। কেউ বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা রকম প্রশ্ন করে পাঠান— যার উত্তর ছাপা হয় 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগে। এই সমস্ত চিঠি খুলে পড়ে বিভিন্ন দপ্তরে পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনেক দেরি হয়ে যায়। তাই কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের অনুরোধ তারা যেন চিঠি বা খামের উপরে বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে লিখে দেন। যেমন:

এক : কি ধরনের লেখা : ছড়া, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি।

দুই : সংশ্লিষ্ট বিভাগের উল্লেখ করা : বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা, প্রশ্নোত্তর, নিজে কর বা ছোটদের দপ্তর ইত্যাদি।

তিন : সাধারণ চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে 'চিঠিপত্র' এবং কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের চিঠি হলে সেই, বিষয়ের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। যেমন, 'ঘনাদা ক্লাব' ইত্যাদি।

চার : আমন্ত্রিত রচনা বা প্রতিযোগিতামূলক রচনার ক্ষেত্রে সেই বিষয়ের উল্লেখ খাম বা চিঠির উপরে থাকা প্রয়োজন।

আশা করি কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা আমাদের সহযোগিতা করবেন।

সম্পাদক

R/No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 4th Yr Vol I · May 1984 Regd No WBEC/255

সচিত্র জ্ঞানবিজ্ঞান

অমরনাথ রায়
সংখ্যা নিয়ে খেলা ৮·০০

সমরজিৎ কর
নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ১৫·০০ সমুদ্রের সম্পদ ৮·০০

অরূপরতন ভট্টাচার্য
রোবোট এল কেমন করে ৬·০০

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার ৬·০০

অমরনাথ রায়
সায়েন্স ক্যুইজ ১০·০০

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু
কিশোর রচনাসমগ্র ২৫·০০
সঙ্কলন ও সম্পাদনা : **দিবাকর সেন**

বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের গল্প

লীলা মজুমদার
কল্পবিজ্ঞানের গল্প ১৫·০০

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
লুপ্তধন ৮·০০ মেঘনাদ ১০·০০

অদ্রীশ বর্ধন
কিশোর সায়েন্স ফিকশ্যান ১৫·০০

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
তুষারলোকের রহস্য ৮·০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড · কলকাতা ৯

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা–৯ হইতে প্রকাশিত
এবং চৌধুরী প্রিন্টিং ওয়ার্কস পি-২১ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত। দাম তিন টাকা।
প্রচ্ছদমুদ্রণ রূপসা এন্টারপ্রাইজ, ২০০ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২